মোহনা

হরিশংকর জলদাস

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পেছন থেকে চণ্ডকের কানে ভেসে এল মোহনার কণ্ঠ, 'তোর আসল পুরস্কারটা নিয়ে যা রে, চণ্ডক। তোরে এই পুরস্কার দেওয়ার জন্য আমি পালিয়ে যাই নাই। অধীর আগ্রহে তোর জন্য প্রতীক্ষা করেছি।'
চমকে পেছন ফিরল চণ্ডক। বিহ্বল-বিস্ফারিত চোখে দেখল, মোহনার প্রচণ্ড ঘৃণা মেশানো চোখ থেকে আগুন ঝরছে।
'মোহনা, কী করছ, কী করছ, মোহনা?' বলতে চাইল চণ্ডক। তার আগেই চণ্ডকের মস্তক বরাবর মোহনার হাতের বঁটিটি নেমে এল। ভূমিতে লুটিয়ে পড়ল মোহনার ভালোবাসার চণ্ডক, মোহনার ঘৃণার চণ্ডক।
উন্মাদিনীর মতো মোহনা হেসে উঠল—খিল খিল খিল খিল।

মোহনা হরিশংকর জলদাস

প্রথমা

ISBN 978 984 90193 9 8

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই উপন্যাসের কাহিনির কাল একাদশ শতাব্দী। স্থানের বৃত্ত বিশাল বরেন্দ্রভূমি। তারই দুই ধর্ম-সম্প্রদায়—পাল রাজা আর সাধারণ কৈবর্তরা মুখোমুখি। দ্বন্দ্ব-সংঘাতে পরস্পর সংক্ষুব্ধ। রাজ্যশাসনভার কার করতলগত হবে—শূদ্রদের, না বৌদ্ধদের? ঘটনার এই জটাজালে জড়িয়ে পড়ল কথিত ছোটজাতের কৈবর্তরা। ঘোরতর যুদ্ধে মুখোমুখি হলেন পালরাজা রামপাল আর কৈবর্তরাজ ভীম। রামপালের সহায় চৌদ্দ জন সামন্ত। আর ভীমের সহায় তার পালকপুত্র চণ্ডক। তার শরীরে বহমান বৌদ্ধ রক্ত। তার জন্মসূত্র রহস্যজালে ঘেরা। চণ্ডক গভীরভাবে মগ্ন বারবনিতা মোহনার রূপসৌন্দর্যে। তার অপার রূপ-যৌবন চণ্ডকের কাছে দুর্বার আকর্ষণের মতো। অথচ সেই মোহনার হাতেই অন্তিমে তার যে পরিণতি, পাঠককে নিঃসন্দেহে তা উদ্বেল ও উৎকণ্ঠ করবে। বস্তুত, *মোহনা* পাল রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে কৈবর্ত-গণতন্ত্রের সংঘাতের কাহিনিমাত্র নয়, এক গভীর মানবিক আখ্যানেরও আধার। দিব্যোক, ভীম, শার্বদেব, কঙ্কণদেব, রামপাল, মথনদেব ও চণ্ডককে ঘিরে এই উপন্যাসের কাহিনি আবর্তিত হলেও এর কেন্দ্রে মোহনীয় মোহনা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রতিকৃতি : রাশেদ মাহমুদ

হরিশংকর জলদাস

জন্ম ১২ অক্টোবর ১৯৫৫, চট্টগ্রামের জেলেপল্লিতে। চুয়াল্লিশ বছর বয়সে কাকতালীয়ভাবে লিখতে আসা। প্রথম উপন্যাস *জলপুত্র*। এ উপন্যাসের জন্য পেয়েছেন আলাওল সাহিত্য পুরস্কার। দ্বিতীয় উপন্যাস *দহনকাল* লাভ করে 'প্রথম আলো বর্ষসেরা বই' পুরস্কার। আরও দুটি উপন্যাস *কসবি* ও *রামগোলাম*। *রামগোলাম* উপন্যাসের জন্য পেয়েছেন সিটি-আনন্দ আলো পুরস্কার ও মানবাধিকার সম্মাননা পদক। দুটি ছোটগল্প সংকলন *জলদাসীর গল্প* ও *লুচ্চা*। বাংলা একাডেমী থেকে বেরিয়েছে তাঁর ডক্টরাল থিসিস *নদীভিত্তিক বাংলা উপন্যাস ও কৈবর্তজনজীবন*। অন্যান্য গদ্যগ্রন্থ *জীবনানন্দ ও তাঁর কাল, লোকবাদক বিনয়বাঁশী*। হরিশংকর জলদাসের কথাসাহিত্য ব্যতিক্রমী। তাঁর উপন্যাসের চরিত্ররা প্রান্তজন। জেলে, বারাঙ্গনা, মেথর, কোটনা—এরা তাঁর কথাসাহিত্যের কুশীলব। হরিশংকর শুধু কাহিনি লেখেন না, সমাজকেও আঁকেন।

প্রচ্ছদ : সব্যসাচী হাজরা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মোহনা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মোহনা

হরিশংকর জলদাস

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উৎসর্গ

টুনি,
আমি যে তোমাকে ভালোবাসি
তুমি জানো না,
তুমি যখন আমাকে ভালোবাসতে
শুরু করবে,
তখন আমি জানব না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এক

কালিন্দী নদী বরেন্দ্রি ছাড়িয়ে দক্ষিণে এগিয়ে গেলে তার নাম হয়ে যায় রায়মঙ্গল। রায়মঙ্গল আরও দক্ষিণে এগিয়ে গিয়ে পড়েছে বঙ্গোপসাগরে। সর্বদা কালিন্দীর ভরা যৌবন; বর্ষায় তার যৌবনে ষোড়শীর চাঞ্চল্য—খলখল, ছলাচ্ছল; অন্য ঋতুতে রমণীর রমণীয় গাম্ভীর্য—শান্ত, সৌম্য। বৈশাখ থেকে চৈত্র—দুকূল ছাপানো জল। তার উত্তর পারে ডমরনগর—দিব্যোক-রুদক-ভীমের রাজধানী, কৈবর্তসমাজের একমাত্র অহংকারের জায়গা। রাজধানীতে রাজা-রাজন্য, সৈন্যসামন্ত, পেয়াদা-স্তাবক, সুবিধাভোগী-সুবিধালোভী, ধূর্ত-ধান্ধাবাজ—এদের বসবাস। কালিন্দীর দক্ষিণ পারে জঙ্গল আর পাহাড়, চারণভূমি আর শস্যে ভরা শ্যামল প্রান্তর। বরেন্দ্রির মৃত্তিকার রং গৈরিক। গৈরিক রঙের মাটি উর্বরা। কালিন্দী দক্ষিণ পাড়ে তার পলল ছড়িয়ে দেয় প্রতিবছর। তার এই পলি দক্ষিণ পাড়ের ভূমিকে করেছে স্বর্ণপ্রসবা। এ মৃত্তিকায় ফসলের সমাহার, বৃক্ষের ঘন পল্লবের শ্যামলাভা, তৃণের ত্বরিত প্রবৃদ্ধি। নদীর তীরে তীরে আর পাহাড়ের খাঁজে খাঁজে গো-চারণভূমি। চারণভূমির পাশে পাশে ফসলি মাঠ। চারণভূমি ও শস্য-শ্যামলা প্রান্তরকে ঘিরে হালিকদের বসবাস। কৈবর্তদের দুটো ধারা—হালিক কৈবর্ত আর জালিক কৈবর্ত। হালিকরা চাষবাস, গো-পালন নিয়ে থাকে। মাঠে মাঠে ফসল ফলায় তারা। জালিকদের ফসল নদীতে। মৎস্যশিকারই জালিকদের একমাত্র পেশা। জাল-নৌকা-হাল-পাল তাদের শিকারের অস্ত্র। জালিকরা থাকে কালিন্দীর তীরে তীরে। মাছে থইথই মিষ্টি জলের নদী কালিন্দী, তবে পুরোপুরি নয়। মোহনা থেকে বেশ কয়েক মাইল উজান পর্যন্ত মিষ্টি আর নোনা জলের মেশামেশি। আরও উজানে মিষ্টি জল। মোহনার দিকে সমুদ্রের মাছ। নোনা জলের মাছের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আনাগোনা এ অংশে—তপসে, সুন্দরী, ভোলপোঁপা, পাঙাশ—এসব। ডমরনগরলগ্ন কালিন্দীজলে নানা মাছের ছড়াছড়ি। রোহিত, পাবদা, চিতল, কাতল, বাইম, কোড়াল, চিংড়ি, বাতাসি, বোয়াল। বর্ষায় কালিন্দীর এ অংশে ইলিশ ধরা পড়ে জালিকদের জালে। সমুদ্র থেকে উজান বেয়ে তার মিষ্টি জলে ডিম পাড়তে আসে ইলিশরা। এসব মাছে জালিকদের জীবন চলে।

পাহাড়ের গায়ে আর পাদদেশে নিষাদরা থাকে। জালিকদের মতো তারাও শিকারি। তাদের শিকার্য নানা পাখি, বন্য হরিণ, বরাহ, কুক্কুট, ছাগল, গুঁইসাপ, ভেড়া। ফাঁদ পেতে এবং তির ছুড়ে তারা এসব পশুপাখি শিকার করে। বন্য গরু আর মহিষ ধরে তারা পোষ মানায়। পাহাড়ের গায়ে গায়ে তারা চাষ করে—ধানের, যবের, ভুট্টার, মরিচের, আদার, রসুনের। ওই দিকে, একটু দূরে বসবাস করে ডোমরা। শ্মশান এবং মদ নিয়ে তাদের দিন কাটে। তারপর সূত্রধর, তন্তুবায়, তৈলকার, নরসুন্দর, কাংস্যকার—এদের বসবাস আলাদা আলাদা। ভিন্ন ভিন্ন সমাজের ভিন্ন ভিন্ন পাড়া। তাদের প্রথা, সংস্কার পৃথক পৃথক। কিন্তু ধর্মবিশ্বাস এক। বহু দেবদেবীতে বিশ্বাসী তারা। কিন্তু তাদের প্রধান দেবতা শিব। তাদের রাজা ভীম শিবের পরম ভক্ত। প্রজারা ভীমকে প্রাণের অধিক ভালোবাসে। তাই ভীমের প্রধান পূজনীয় দেবতা প্রজাদেরও প্রধান উপাস্য-দেবতা।

হালিক-জালিক একজাত, কৈবর্ত তারা। তার পরও কোথায় যেন একটু ফারাক রয়ে গেছে। হালিকদের একটু নাক উঁচা। জালিকদের ওরা হেয় চোখে দেখে। ভাবে, ওদের তো নৌকা-জাল-মাছ-নদী ছাড়া আর কিছুই নেই। নৌকা-জাল-মাছ-নদী চঞ্চলা। যেকোনো সময় নৌকা ডুবতে পারে, জাল ছিঁড়তে পারে। আর মৎস্য তো স্থানান্তরকামী। যেখানে জলের প্রাচুর্য, সেখানে মৎস্যের গমন। কালিন্দীতে জল কমে এলে মৎস্যেরও স্বল্পতা দেখা দেয়। নদী তো উৎস থেকে মোহনা পর্যন্ত চঞ্চল পায়ে পথ পরিক্রমণ করে। ভাঙনপ্রবণ কালিন্দী ইচ্ছে করলে যেকোনো মুহূর্তে জালিকদের জীবনে বিপর্যয়ের সূচনা করতে পারে। কিন্তু আমাদের দিকে তাকাও। কত সুখে আছি আমরা। মাটি-ফসলের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক। শস্য-প্রসবা মৃত্তিকা নদীর মতো চঞ্চল নয়। সে স্থির ও বিশ্বস্ত। সংবৎসর এই মৃত্তিকা আমাদের অন্ন জোগায়, রবিশস্য জোগায়, ফল জোগায়, ফুল জোগায়। আমাদের জীবনের নিরাপত্তা আছে, স্থায়িত্ব আছে; কিন্তু জালিকদের নেই। তাই জালিকদের তুলনায় আমরা, হালিকরা বনেদি। তাদের তুলনায় আমরা বিত্তশালী, তাই আমরা বংশগৌরবে উঁচু।

কিন্তু দিব্যোক যখন ডাক দিলেন, ভীম যখন পালদের সঙ্গে যুদ্ধ করার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আহ্বান জানালেন—তখন হালিক-জালিকের মধ্যে কোনো পার্থক্য থাকল না। ব্যাধ, ডোম, মুচি, ধোপা, নাপিত প্রভৃতিরা বজ্রমুষ্টি ওপরে তুলে ধরে চিৎকার করে বলল, 'দিব্যোক মোরাদের রাজা। ভীম বরেন্দ্রি সূর্য। পাল রাজা নিপাত যাক। প্রাণ দেব, কিন্তু পালদের হাতে মোরাদের স্বাধীনতা তুলে দেব না।'

চারণভূমির চারপাশে, পাহাড়ের পাদদেশে, শস্য-প্রসবা প্রান্তরে আম্র, মহুয়া, বাঁশ, পান, ইক্ষুর চাষ। পাহাড়ের গায়ে গায়ে নানা মূল্যবান বৃক্ষ—সেগুন, দেবদারু, শাল, শিশু, মেহগনি, নিম, বট, শিমুল, অশ্বত্থ। একটা পাহাড় শুধু চন্দনবৃক্ষের। রাজার প্রহরীরা এ পাহাড় পালা করে পাহারা দেয়। রাজার আদেশে বিনা মূল্যে মন্দিরে মন্দিরে চন্দন কাষ্ঠ যায়। ওই কাষ্ঠে দেবদেবীর পুজো হয়। বাড়িতে বাড়িতে আম, কাঁঠাল, তেঁতুল, বাদাম, চালিতা, তালগাছের ছড়াছড়ি। মাঠে মাঠে ধান, অড়হর, মসুর, খেসারি, সরিষা, মটর, কলাই, গোধুমের চাষ। পাহাড়ে-অরণ্যে গন্ডার, গাধা, তরক্ষু, শৃগাল, উল্লুক, ঘোটক, ভল্লুক, বিড়াল, হাতি, খরগোশ, মহিষ, শূকর, ব্যাঘ্র, ভেড়া, হরিণ আর বানর। বরেন্দ্রির প্রধান ফসল পান, গুবাক আর নারকেল। বরেন্দ্রির প্রধান রপ্তানিদ্রব্য গুবাক, নারকেল ও মহুয়া।

ছোট-মাঝারি নৌকা এপাড়-ওপাড় করে। দক্ষিণ পারের উৎপন্ন ফসল আসে উত্তর পারে। অরণ্য থেকে মূল্যবান কাঠ আসে। আর আসে গুবাক, নারকেল ও মহুয়া। বড় বড় পালতোলা বাণিজ্যপোত ভিড়ে উত্তর পাড়ে। বিশাল বিশাল পাথরখণ্ড ফেলে কালিন্দীর এই অংশকে বাঁধিয়ে দেওয়া হয়েছে। বিশাল পাথরখণ্ডের ওপর ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে পাথরচূর্ণ। নদীপাড়কে এমনভাবে বাঁধানো হয়েছে, যাতে সহজে বিদেশি বাণিজ্যপোতগুলো কূলে ভিড়তে পারে। নদীপাড়ের বৃহৎ একটি স্থানের তিন দিক ঘিরে ফেলা হয়েছে। নদীর দিকে খোলা। রাজ-উদ্যোগেই এ রকম করা হয়েছে। অর্থবিষয়ক রাজমন্ত্রী আমদানি-রপ্তানির বিষয়টি তদারক করেন। কয়েকজন ব্যবসায়ীর সহযোগিতায় ডমরনগর থেকে গুবাক, নারকেল আর মহুয়া রপ্তানি হয়। ডমরনগরের এ অংশ কৈবর্তরাজের ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্র। বিনিয়ুক্তক নামে একশ্রেণীর রাজপুরুষ আছে। তারা মন্ত্রীর নির্দেশমতো ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনার দায়িত্ব পালন করে। ঘেরা স্থানের তিন দিকে বড় বড় ঘর। সে ঘরেই জমা রাখা হয় পান, সুপারি, মহুয়া। বাঙালি বণিকেরা দক্ষিণ ভারতের সমুদ্রোপকূল বেয়ে গুজরাট পর্যন্ত বাণিজ্যসম্ভার নিয়ে যায়। সেসব জায়গা থেকে তারা আনে গুয়ার বদলে মাণিক্য, পানের বদলে মরকত, নারকেলের বদলে শঙ্খ, মহুয়ার বদলে লবণ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আরব-পারস্য প্রভৃতি দেশে গুবাকের খুব কদর। এভাবে বরেন্দ্রির গ্রামে গ্রামে উৎপাদিত ফসল ভারতবর্ষ এবং ভারতবর্ষের বাইরে ছড়িয়ে পড়ে।

কালিন্দীর উত্তর পাড়ে গুজরাটের একটি বাণিজ্যপোত ভিড়েছে। স্বর্ণ, মাণিক্য, মণি-মরকত—এসব এনেছে ও দেশের বণিকেরা। এগুলোর বদলে তারা গুবাক আর নারকেল নিয়ে যাবে বরেন্দ্রি থেকে। বাণিজ্যপোতটি থেকে মূল্যবান দ্রব্যাদি খালাস করা হচ্ছে। বিনিয়ুক্তকেরা মাল খালাসের তদারক করছে। সতর্ক দৃষ্টি তাদের। মাল খালাসকারীদের প্রতিই বেশি নজর তাদের। কোনো মণিমুক্তা সরাতে চাইলে তাদের হাতেই সুযোগ বেশি। খুব বিশ্বস্ত মানুষদের বেছে নেওয়া হয়েছে এ ব্যাপারে। তার পরও সতর্কতার বিকল্প নেই। অর্থবিষয়ক রাজমন্ত্রীর কড়া নির্দেশ, কোনো মালামাল খোয়া গেলে বিনিয়ুক্তকেরাই দায়ী থাকবে।

সূর্য পশ্চিমে গড়িয়েছে। নদীর দিক থেকে শীতল বাতাস বইতে শুরু করেছে। শীতল বাতাসের ছোঁয়ায় সূর্যের তেজ কমে আসতে শুরু করেছে। বাণিজ্যপোতটি থেকে মাল খালাস প্রায় সম্পন্ন হয়ে চলেছে। হিসাবরক্ষক মণি-মাণিক্যের তালিকা তৈরিতে ব্যস্ত।

'এবার কী কী মণিমুক্তা এল, সনাতন?'

সনাতন মুখ তুলে তাকিয়েই শশব্যস্তে উঠে দাঁড়াল। কণ্ঠে বিনয় ঢেলে বলল, 'আজ্ঞে, নানা রকম মণি-মাণিক্য, মরকত আর কেয়ুর, কঙ্কণ, প্রবালের সিঁথি আর আর...।' আর আর করতে করতে সনাতন ঢোঁক গিলে চুপ মেরে গেল।

চণ্ডক বলল, 'আর, আর করে থেমে গেলে কেন, সনাতন? আর কী?'

চণ্ডক বরেন্দ্রির রাজা ভীমের ডান হাত, প্রাণঘাতী যুদ্ধের সহচর। ভীমের সিংহভাগ প্রতাপ ও ভালোবাসা চণ্ডককে ঘিরেই আবর্তিত হয়। চণ্ডক ভীমবাহিনীর সেনানায়কদের মধ্যে বিশিষ্ট। প্রবল-প্রতাপী এই চণ্ডক প্রশ্ন করার পরও হিসাবরক্ষক সনাতন চুপ মেরে থাকল। এবার চণ্ডক গর্জন করে উঠল, 'সনাতন, তোমার কাছে আমার পরিচয় কি নতুন করে তুলে ধরতে হবে? তুমি আমার প্রতাপ-প্রতিপত্তি বিষয়ে সঠিক অবগত নও বোধ হয়!' চণ্ডকের গর্জন শুনে সকল বিনিয়ুক্তক, প্রহরী দ্রুত সেখানে উপস্থিত হলো। তারা ব্যাপারটি সম্যক বুঝে ওঠার আগে তরবারির বাঁটে হাত রেখে চিবানো কণ্ঠে চণ্ডক আবার বলল, 'আমি কি ছুঁচ মেরে হাত গন্ধ করব, সনাতন?'

সনাতন ভীতসন্ত্রস্ত কণ্ঠে বলল, 'আরেকটা মহামূল্যবান বস্তু এসেছে। তবে তার হদিস দেওয়ার ব্যাপারে নিষেধ আছে।'

'কার নিষেধ? কেন নিষেধ?' চণ্ডকের কণ্ঠে আগের উত্তাপ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'মহারাজ ভীমের পুত্র শর্বের নিষেধ আছে,' সনাতন বড় একটা ঢোঁক গিলে বলল। চণ্ডকের চোখ চকচক করে উঠল। রাজপুত্রের নিষেধ! শর্ব ভীমের প্রথম পুত্র। সম্প্রতি তার বিয়ে হয়েছে। চণ্ডক জানে, এই বাণিজ্যপোতে করে শুধু মণিমুক্তা, মরকত ইত্যাদি এসেছে। শর্ব তার স্ত্রীর জন্য বিশেষ কোনো মূল্যবান অলংকার আনেনি তো? ভীমপুত্র শর্বের নাম শুনে চণ্ডক প্রথমে একটু ভড়কে গেল। কিন্তু থতমত খাওয়া ভাবটি সে তার চেহারায় ফুটে উঠতে দিল না। ভড়কানো ভাবটাকে বুকের তলায় চেপে রেখে স্বাভাবিক কণ্ঠে চণ্ডক বলল, 'আহা সনাতন, আমি কি ওই মূল্যবান দ্রব্যটি তোমার কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে যাব যে তুমি আমাকে বলতে চাইছ না! আমি শুধু নামটা জানতে চাইছি।'

এর পরও সনাতনের নিশ্চুপ থাকা দেখে একজন বয়স্ক বিনিয়ুক্তক বলল, 'সনাতন, চণ্ডক এই কৈবর্ত-দেশের একজন প্রধান পুরুষ, ভীমরাজের একান্ত প্রিয়ভাজন। উনি যখন নামটা জানতে চাইছেন, নামটা বলো।'

সনাতন একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে নিম্নস্বরে বলল, 'নবরত্ন হার। যুবরাজ শর্বদেব তার নবপরিণীতার জন্য গুজরাট থেকে হারটি বিশেষভাবে তৈরি করিয়ে আনিয়েছেন।'

'কই, দেখি দেখি হারটি,' প্রবল আগ্রহভরা কণ্ঠে চণ্ডক বলে উঠল।

এবার বয়স্ক বিনিয়ুক্তক বলল, 'ওইটুকু স্বাধীনতা আমাদের নেই মাননীয়। সনাতন যে হারের হদিসটি দিয়েছে, তাতেও নিষেধ ছিল। আপনার আবদারে সে নিষেধ ভাঙা হয়েছে।'

'আবদার! বলো নির্দেশ। নির্দেশ দিয়েছি আমি তোমাদের, মূল্যবান বস্তুটির নাম বলার জন্য। আর এখন আবার নির্দেশ দিচ্ছি, ওই নবরত্ন হারটি দেখানোর জন্য,' চণ্ডক আগের মেজাজে ফিরে গেল।

বয়স্ক বিনিয়ুক্তক চণ্ডকের কথার মধ্যে দুরভিসন্ধির আভাস পেল।

মহারাজপুত্র শর্বদেবের নিষেধের কথা শুনেও নবরত্ন হারটি দেখার জন্য চণ্ডকের এই পীড়াপীড়ির মধ্যে নিশ্চয়ই কোনো খারাপ উদ্দেশ্য আছে। বিনিয়ুক্তক মনকে শক্ত করে জবাব দিল, 'আপনার নির্দেশ এবং মহারাজপুত্র শর্বের নির্দেশের মধ্যে পার্থক্য আছে। আপনার চেয়ে শর্বদেব আমাদের কাছে বড়। তাঁর নির্দেশই আমাদের মানতে হবে। আমরা অপারগ সেনাপতি, আপনার নির্দেশ পালন করতে আমরা বাধ্য নই।'

সমবেত প্রহরী, বিনিয়ুক্তকদের মধ্যে সমর্থনসূচক গুঞ্জন উঠল। চণ্ডক হঠাৎ তরবারি কোষমুক্ত করে সামনে রক্ষিত পেটিকার তালায় আঘাত করল। তালাটি টং করে দ্বিখণ্ডিত হয়ে মেঝেতে পড়ে গেল। এক ঝটকায় পেটিকার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ডালা খুলে ফেলল চণ্ডক। দেখল, অনেক মণিমুক্তার মাঝখানে নবরত্নখচিত হারটি জ্বলজ্বল করছে। চারপাশে ছড়িয়ে থাকা মণিমুক্তা-মরকতগুলো হারটির ঔজ্জ্বল্যের কাছে নিতান্ত ম্লান মনে হচ্ছে। চণ্ডকের চোখের মণি চকচক করে উঠল। কী যেন একটা বাসনা তার দুই চোখে আর মুখে খেলা করা শুরু করল। চণ্ডক চট করে হারটি তার ডান হাতে তুলে নিল। সনাতন, বিনিয়ুক্তক আর প্রহরীরা বুঝে ওঠার আগেই এসব কিছু ঘটে গেল। বয়স্ক বিনিয়ুক্তক এবং সনাতন ত্বরিত সামনে এগিয়ে এল। বুক টান টান করে বয়স্ক বিনিয়ুক্তক বলল, 'সেনাপতি চণ্ডক, আপনি অন্যায় করছেন, রাষ্ট্রীয় অর্থশালায় আপনি হাত বাড়িয়েছেন। এটা ঘোরতর অপরাধ। আপনি হারটি যথাস্থানে রেখে দিন। এতক্ষণ যা করেছেন, তা আমরা এড়িয়ে যাব। আমরা আপনার মর্যাদার কথা চিন্তা করে অর্থমন্ত্রী পর্যন্ত পৌঁছাব না আপনার কৃতকর্মের ব্যাপারটি।'

অর্থমন্ত্রীর নাম শুনে চণ্ডকের মেজাজ তিরিক্ষি হয়ে উঠল। মহারাজের কাছে চণ্ডক যতবার কিছু অর্থ প্রার্থনা করেছে, ততবারই অপচয়ের দোহাই দিয়ে ওই শয়তান অর্থমন্ত্রী বাধা দিয়েছে। এ মুহূর্তে অর্থমন্ত্রীর কথা শুনে চণ্ডক তেলেবেগুনে জ্বলে উঠল। মহারাজ ভীমের কাছে অর্থমন্ত্রীকে হেয় প্রতিপন্ন করার এই তো সুবর্ণ সুযোগ। এই সুযোগ হাতছাড়া করা যাবে না। বিনিয়ুক্তকের কথায় কান না দিয়ে চণ্ডক নবরত্ন হারটি ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখতে লাগল। তার চোখের সামনে হঠাৎ মোহনার চেহারা ফুটে উঠল। আহা! এই হারটি যদি মোহনার গলায় পরানো যায়, তাহলে মোহনা কী খুশিই না হবে! এই হার তার চাই-ই চাই। মহারাজ ভীম যত দুঃখই পান, এই নবরত্ন হারটি মোহনার গলায় ঝোলাতেই হবে।

চণ্ডক হাততালি দিল। বাইরে দণ্ডায়মান তার দেহরক্ষীদের মধ্য থেকে দুজন তড়িৎবেগে কক্ষে প্রবেশ করল। চণ্ডক বলল, 'ওই বুড়া-হাবড়া বিনিয়ুক্তককে বন্দী কর। হাত-পা বেঁধে তাকে এই কক্ষের এক কোনায় ফেলে রাখ।'

তারপর এক ঝটকায় সামনে থেকে সনাতনকে সরিয়ে দিয়ে হারটি নিয়ে কক্ষ থেকে বেরিয়ে এল চণ্ডক। কক্ষ থেকে বেরোনোর আগে রক্তচক্ষু পাকিয়ে চণ্ডক বলল, 'আজকের ঘটনার ব্যাপারে কেউ মুখ খুলেছ তো তার মৃতদেহ ওই কালিন্দীর জলে ভাসবে কালকে।'

চণ্ডকের উগ্রমূর্তি দেখে এবং তার পূর্বতন নিষ্ঠুরতার কথা স্মরণ করে ভয়ে সবাই থরথর করে কাঁপতে লাগল। ঘর থেকে বেরিয়ে চণ্ডক মোহনার আবাসস্থলের দিকে রওনা দিল। পেছনে পড়ে থাকল বন্দী বয়স্ক বিনিয়ুক্তক, অসহায় সনাতন আর নির্বাক অন্যরা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুই

বাণিজ্যকেন্দ্রের অদূরে বারাঙ্গনাপল্লি। রাজধানীর বাইরে কালিন্দীর উত্তর পাড় ঘেঁষে বারাঙ্গনাপল্লিটি। পাশেই বাজার, নিত্যদিন গমগম। দক্ষিণ পারের মানুষের জীবনযাপনের দ্রব্যাদি দিয়ে এই বাজারের বিপণিগুলো সাজানো। কখনো কখনো রাজধানীবাসীও এই বাজারে আসে। বাজারে দেশীয় দ্রব্যাদির পাশাপাশি বিদেশি মনোলোভা দুর্লভ বস্তুও পাওয়া যায়। তাই শহুরে আর গেঁয়ো—উভয় শ্রেণীর মানুষ জড়ো হয় এই বাজারে। এখানে আসে তৈলকার, স্বর্ণকার, সূত্রধর, তন্তুবায়, নরসুন্দর; আসে মাঝিমাল্লা; আসে মৎস্যজীবী, চাষি। আর আসে রাজন্য, সৈন্য, প্রহরী, ধান্ধাবাজ; আসে চোর-বাটপার। আসে ক্রেতা, আসে বিক্রেতা। আসে বারাঙ্গনারা। তারা কেনে প্রসাধনী, পট্টবস্ত্র, কস্তুরি, আলতা, মাথার রঙিন আবরণী আর ফিতে। কেনে পাদুকা, ওষ্ঠ-রঞ্জনি। কেনে গুবাক, কেনে পান। এসব তাদের প্রতি রাতের প্রয়োজনীয় সামগ্রী। এগুলো তাদের জীবিকার বাহন। এগুলো দিয়ে তারা তাদের দেহকে সজ্জিত করে। সজ্জিতদেহ ক্ষণিক-অতিথিদের লোভাতুর করে তোলে।

AMARBOI.COM

যে ঘাটে দক্ষিণের মাঝিরা নৌকা ভেড়ায়, তা থেকে সামান্য পশ্চিমে বারাঙ্গনাপল্লিটি। জোয়ার-ভাটার নদী কালিন্দী। জোয়ারে নদী ভরভর। ভাটায় জল নেমে যায় নিচে। জল নেমে গেলে নদীর কূল ঘেঁষে চর জাগে। বারাঙ্গনাপল্লি থেকে দু'কদম হাঁটলেই নদীপাড়। ওই পাড় থেকে ভূমি ঢালু হয়ে চরের সঙ্গে মিশেছে। বারাঙ্গনাপল্লি থেকে একটি গলিপথ নদীপাড় পর্যন্ত বিস্তৃত। নদীপাড় থেকে নদীজল। বারাঙ্গনারা সকালে একবার, সন্ধ্যায় আরবার গা-গতর ধুতে যায় কালিন্দীর জলে। পুরুষবর্জ্য শরীর থেকে সাফ করতে হয় যে তাদের! শরীরের এমন কোনো স্থান নেই, যেখানে পুরুষের হাত-ঠোঁট লাগে না। শরীরের ভাঁজে ভাঁজে পুরুষের ক্লেদাক্ত স্পর্শ লাগে। পর্যায়ক্রমে অনেকের ক্ষুধা মেটাতে গিয়ে বারাঙ্গনারা ক্লান্ত হয়ে পড়ে। তার পরও অবসন্ন দেহ নিয়ে খদ্দেরের পাশে শুতে হয় তাদের। পুরুষবর্জ্যে বর্জ্যে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বারাঙ্গনারা সয়লাব হয়ে যায়। শরীর থেকে এসব ধুয়েমুছে পরিচ্ছন্ন হতে হয়। তাই তারা ভোরে আর সাঁঝবেলায় কালিন্দীজলে অবগাহনে নামে। একবুক জলে দাঁড়িয়ে শরীরের আনাচে-কানাচে নরম কাপড় ঘষে।

রাতে-দিনে অতিথি আসে বারাঙ্গনাগৃহে। পুরুষের শরীরক্ষুধার কোনো রাত-দিন নেই, সকাল-সন্ধ্যা নেই, বর্ষা-হেমন্ত নেই। শরীর চঞ্চল হলে তাদের নারীদেহ চাই-ই চাই; নরম, রসে ভরা নারীশরীর। শরীরের সঙ্গে সঙ্গে চাই রূপ—সৌষ্ঠবময়। চাই পুরুষহৃদয় নাচিয়ে দেওয়ার মতো কটাক্ষ, কূলপ্লাবী সুগহিন অন্ধকার গহ্বর।

পুরুষেরা রসের কারবারি, তারা শুকনা সন্ন্যাসী নয়। সুযোগ পেলেই তারা বন্ধন ছিঁড়ে অসংযমী হয়। তখন তারা ছোটে বাইরের অঙ্গনার কাছে। বারাঙ্গনাপল্লিতে ক্ষুধা মেটাতে আসে মাহুত, মশালচি, শ্মশানের ডোম, জল্লাদ; শরীরের ভার কমাতে আসে সৈন্য, চারণকবি, টিকিনাড়া ব্রাহ্মণ; আসে হাটুরিয়া, বাজারিয়া। আসে রাজন্য আর আসে চণ্ডক।

মোহনার কাছেই আসে চণ্ডক। চণ্ডক ভীমের ডান হাত, অন্যতম সমরনায়ক।

সহযোদ্ধা হিসেবে আর রাজ্যশাসনে পরামর্শক হিসেবে ভীম চণ্ডককে গুরুত্ব দেন। চণ্ডক থাকে রাজধানীতে, রাজপ্রাসাদলগ্ন একটি নয়নাভিরাম অট্টালিকায়। চণ্ডক রাজধানীতে থাকলে কী হবে, তার মন পড়ে থাকে কালিন্দীপাড়ের এই বারাঙ্গনাপল্লিতে। এখানে থাকে তার মোহনা। নদী আর সমুদ্রের মিলনস্থল মোহনা। এই মোহনাতেই মিষ্টি জল আর নোনা জলের মাখামাখি, লুটোপুটি। মোহনা চণ্ডকের নদী, আর চণ্ডক মোহনার সমুদ্র। নদী সমুদ্রকে আর সমুদ্র নদীকে পেয়ে তৃপ্ত। মোহনার কাছেই চণ্ডকের সকল আনন্দ, সকল দেহসুখ জমা আছে। নদীর অন্য নাম রোধবতী। নদীর বেগ আছে, আবার বেগ রোধ করার দুটো তীরও আছে। তীর না থাকলে নদীজল বন্যায় রূপান্তরিত হয়। মোহনাও কূলপ্লাবী হয়, চণ্ডকের সান্নিধ্যে মোহনার দুকূল ভাসে। মোহনার সান্নিধ্যে চণ্ডকের শরীরে ঝঙ্কার ওঠে। মোহনার চকিত নেত্রপাতে চণ্ডকের হৃদয়ের অতলতলের অন্ধকারে আলোকপাত হয়। রোদ্দুরে ঝলসে ওঠা চকচকে ছুরির ফলার মতো মোহনার শরীর চণ্ডকের উন্মাতাল দেহকে বিঁধতে থাকে, অবিরাম। মোহনার দেহ তীব্র জ্বালা-জাগানিয়া, দূরভেদী।

বারাঙ্গনাপল্লিটি বিশাল নয়, তবে এর মাঝখানে বড় একটা চত্বর আছে। ওই চত্বরের মাঝখানে একটি কদম্ববৃক্ষ, আদ্যিকালের। চারদিকে শাখা-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রশাখা বিস্তৃত। গোড়াটা শানবাঁধানো। প্রৌঢ় আর বৃদ্ধরা সেই চত্বরে বিকেলবেলা বিশ্রাম নেয়। চত্বরের চতুর্দিকে সারি সারি ঘর, ছোট-বড় নানা কিসিমের। মাটির দেয়াল আর শণে ছাওয়া ঘরগুলো। প্রতিটি ঘরে দু-তিনটে করে গবাক্ষ। দক্ষিণের দেয়াল ঘেঁষেই অধিকাংশ বাতায়ন। ওই বাতায়ন দিয়ে গলগল করে কালিন্দীর বাতাস ঢোকে। প্রতিটি গৃহের একটিমাত্র দরজা। দরজা কারুকার্যময়। কাঠের দরজার কোনোটাতে পুষ্প-ভ্রমর, কোনোটাতে পাখি-হরিণ খোদাই করা, আবার কোনোটাতে রাধাকৃষ্ণের যুগলমিলনের ছবি। দরজার দুদিকে দুটো কচি কলাগাছ। কলাগাছের গোড়ায় পূর্ণ ঘট, মাটির। এগুলো মাঙ্গলিক চিহ্ন। বারাঙ্গনারা বিশ্বাস করে, দরজার সামনে কলাগাছ আর জলভরা ঘট থাকলে তাদের যৌবন কোমলতা আর পূর্ণতায় ভরা থাকবে চিরকাল। বারাঙ্গনাদের ঘরগুলো উঁচু উঁচু, সামনে প্রশস্ত আঙিনা। নানা মনোলোভা দ্রব্য দিয়ে সাজানো। ওখানেই অতিথিদের বসার ব্যবস্থা। অতিথিদের নিয়ে ওখানেই খেলা শুরু করে বারবনিতারা। ছলায়-কলায়, বাকচাতুর্যে, কটাক্ষে, মৃদু স্পর্শে অতিথিদের উত্তাল করে তোলে তারা। অতিথিদের চোখে-মুখে-দেহে একসময় দেহসুখের হাহাকার জেগে ওঠে। ওই ক্ষুধার মাহাত্ম্য বোঝে বারাঙ্গনারা। একটু সময়ে হাত ধরে টানে—চলো। ভেতরে চলো।

কোনো কোনো সময় ভেতরে অতিথি থাকে। নতুন অতিথি অপেক্ষা করে আঙিনায়। ভেতর থেকে পালঙ্কের ক্যাঁচকোঁচ বা দু-এক টুকরো রতি-উন্মত্ত শব্দ কানে ভেসে আসে নতুন অতিথির। নতুন অতিথির শরীর-মন চঞ্চল হয়ে ওঠে। ওই সময় দরজার হুড়কোতে খুট করে শব্দ হয়। রতিক্লান্ত অতিথি প্রশান্ত মনে বেরিয়ে আসে। একটু পরে আঁচল আর বক্ষ আবরণী ঠিক করতে করতে আসে বারাঙ্গনা। নতুন অতিথিকে বলে, 'কষ্ট পেয়েছ বুঝি? অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো তোমাকে।' বলতে বলতে হাত ছোঁয় অতিথির, চুলে আঙুল বোলায়। তারপর বলে, 'চলো, ভেতরে চলো।' মিলনের স্থান যে ভেতরে। ভেতরটা নয়নাভিরাম। একদিকে বিশাল পালঙ্ক, পালঙ্কের পাশে গদিমোড়া হাতলওয়ালা চতুষ্কী। চতুষ্কী ঘেঁষে একগুচ্ছ পুষ্প, পুষ্পাধারে সজ্জিত। ঘরময় অগুরু চন্দনের সুবাস। ঘরের ভেতরের তিন দেয়ালে ছোট ছোট কোটরি। সেই কোটরিতে মৃদু আলোর তৈলপ্রদীপ। পালঙ্কের পাশে গোলাকার ছোট্ট চৌকির ওপর গুবাক-তাম্বুলের বাটা। গুবাক-তাম্বুলের পাত্রটি অসাধারণ সুন্দর হতে হয়। কার পাত্রটি কত সুন্দর, এ নিয়ে বারাঙ্গনাদের মধ্যে প্রতিযোগিতা চলে। মিলনের আগে বারাঙ্গনারা অতিথিদের পান খেতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেয়। নানা মসলা, চিকনকাটা সুপারি আর একটুখানি খয়ের দিয়ে পান সাজিয়ে অতিথিদের ঠোঁটের কাছে তুলে ধরে তারা। পানে অনভ্যস্ত অতিথিও সাদরে গ্রহণ করে ওই পান। রঞ্জিত ঠোঁট দিয়ে বারাঙ্গনার অধর স্পর্শ করে অতিথি। এভাবে খেলা শুরু হয়—দেহখেলা।

জানকি এই বারাঙ্গনাপল্লির প্রধানা। জানকি একদা এই পল্লিরই বারাঙ্গনা ছিল। ছোটবেলা থেকে যাকে সে মা বলে জেনেছে, সেই যশোদা একরাতে জানিয়েছিল, সে তার আসল মা নয়। জানকি তখন যৌবনবতী। যশোদার ছত্রচ্ছায়ায় জানকি তখন এই পল্লির নামকরা বারবনিতা। বয়োভারে ন্যুব্জ যশোদাকে তখন কঠিন অসুখে ধরেছে। মরণব্যাধি। জানকিকে ডেকে মুমূর্ষু যশোদা একরাতে জানাল, 'তুই মোর আসল মেয়ে নস রে, জানকি। রাস্তার ধারে কুড়িয়ে পেয়েছি রে তোরে এক সকালে। কাঁথা জড়িয়ে তোরে ফেলে দিয়েছিল কোনো অভাগীর বিটি।' তারপর একটা লম্বা শ্বাস টেনে যশোদা আবার ধীরে ধীরে বলেছিল, 'ট্যাঁ ট্যাঁ করে কাঁদছিলি তুই। বড় মায়া হয়েছিল মোর। তোহারে কোলে তুলি নিছিলাম আমি। সেই থেকে তুই মোর বিটি। মোরাদের এই পল্লিতে মোর মেয়ের পরিচয়ে তুই বড় হলি। আমার এখন যাবার সময়। তোহার আসল পরিচয় না জানিয়ে মরলে আমার আত্মার শান্তি আসবে না।'

যশোদার পাশে জানকি স্তব্ধ হয়ে বসে ছিল। যশোদাকে তার মাতাপিতার পরিচয় জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে করছিল না। কান্নাও আসছিল না। শুধু যশোদার ডান হাতটা কোলে টেনে নিয়ে চুপচাপ বসে ছিল জানকি। ওই রাতেই মারা গিয়েছিল যশোদা।

তারপর জীবনের নানা চড়াই-উতরাই পার হয়ে জানকি আজ এই বারাঙ্গনাপল্লির প্রধানা হয়েছে। চল্লিশ-পঞ্চাশ জন বারাঙ্গনা তার অধীনে। অধিকাংশই যৌবনবতী। রূপসীর সংখ্যা বেশি। একদিন একটি কালাকোলা মেয়ে জানকির সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল। বলেছিল, 'কালিন্দীর দক্ষিণ পার থেকে এসেছি। ডোমের মেয়ে আমি। মদ খেয়ে স্বামী মরেছে। কোথাও যাবার জায়গা নেই।' ঝুপ করে জানকির পা চেপে ধরে বলেছিল, 'মোরে ঠাঁই দেও ইখানে।'

পাশে দাঁড়িয়ে ছিল অলকা। বলেছিল, 'তুই ইখানে কী করবি রে। ইখানে পুরুষরা যে জন্য আসে, তা তো তোর কাছে নেই রে।'

জানকি অলকার দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করেছিল, 'কী নেই রে এর কাছে?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'রূপ নেই, যৌবন গেছে চুপসে। না খেয়ে না খেয়ে মনে লয়,' অলকা বলেছিল।

'দেহলোভী অতিথিরা কালা-গোরা বুঝে না। যা বুঝে তা নিয়েই মেয়েমানুষ জন্মায়। এরও তা-ই আছে। হাটুরিয়া, বাজারিয়া সন্নেসী, ও-ই নিয়েই খুশি হবে। দু-চার দিন ভালো করে খেলেদেলে চেকনাই বেড়ে যাবে।' কথাগুলো অলকাকে বলে মেয়েটির দিকে মুখ ফিরিয়েছিল জানকি। তাকে বলেছিল, 'বাছা, তোরাদেরও মন্দ কপাল। একটু বিবাদ-বিসম্বাদ হলেই গেরাম ছাড়বি। উঠবি এসে এই বারাঙ্গনাপল্লিতে! আয়, আমার সাথে আয়। দেখি, কী করা যায়!'

বারবনিতাদের নিরাপত্তার দিকে কড়া নজর জানকির। পল্লির চারদিকে সুউচ্চ মাটির পাঁচিল। দক্ষিণ দিকে প্রবেশদ্বার। ওই দ্বার দিয়েই সবার আসা-যাওয়া। প্রবেশদ্বারের ওপর কয়েকজন পুরুষ সতর্ক নজর রাখে। পুরুষগুলো এই পল্লিরই। কোনো না কোনো বারাঙ্গনার সন্তান এরা। এরা মায়ের পরিচয় জানে, পিতৃপরিচয় এদের জানা নেই। জানকি বারাঙ্গনাপল্লির এই প্রহরীদের খাওয়া-থাকার দেখভাল করে। কোনো অতিথি দেহভোগের পর অর্থ না দিলে বা কম দিলে অথবা বারাঙ্গনাদের সঙ্গে মন্দ ব্যবহার করলে ওই প্রহরীরা এগিয়ে আসে। কোনো অন্যায় করে অতিথিদের পার পাওয়ার উপায় নেই। চতুর্দিকের পাঁচিলের মাথায় ভাঙা কাঁচ গাঁথা। ওই পাঁচিল ডিঙিয়ে কারও পালানোর সুযোগ নেই। পল্লির পেছন দিকে একটি গুপ্তপথ আছে। জানকি এবং দু-একজন ছাড়া ওই গুপ্তপথের হদিস আর কেউ জানে না। জানকি যখন এই পল্লির প্রধানা হলো, তখনই করিয়েছে সে ওই গুপ্তপথটি। অলকা জিজ্ঞেস করেছিল, 'ওই পথ কেন রে, জানকি দিদি?'

'প্রয়োজন আছে,' গলায় রহস্য ঢেলে উত্তর দিয়েছিল জানকি।

অলকা বলেছিল, 'কিসের প্রয়োজন?'

জানকি অলকার চোখে চোখ রেখে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকেছিল। তারপর ধীরে ধীরে বলতে শুরু করেছিল, 'যে পুরুষরা মোরাদের দেহ নিয়ে খেলা করে, দেহের ভার কমায়, তারাই একসময় হিংস্র হয়ে ওঠে। দেহখেলায় মত্ত হয়ে বলে, ওরে আমার ময়না রে, ওরে আমার পুতুল রে, তুই ছাড়া আমি বাঁচব না রে। ওই হারামিরাই একসময় ধ্বংস খেলায় মাতে। শত শত বছরের ইতিহাস এই রকম। বুড়াবুড়িদের কাছে শুনেছি। যুদ্ধবিগ্রহ তো লেগেই আছে। জয়ী দল প্রথমেই আঘাত হানে এই বারাঙ্গনাপল্লিতে। বারাঙ্গনাদের কচুকাটা করে। ওই সময় মোরাদের পলানোর পথ থাকে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তুই তো শুনেছিস, মোরাদের রাজা ভীমের সঙ্গে পালদের সম্পর্ক ভালো না। যেকোনো সময় যুদ্ধ লেগে যেতে পারে। তাই মোরাদের পলানোর পথটা করে রাখলাম।'

অলকা স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল জানকির দিকে। হঠাৎ জানকির দুহাত জড়িয়ে ধরে অলকা বলল, 'তোহার অনেক বুদ্ধি, দিদি। মোরাদের নিয়ে অনেক ভাবো তুমি।'

শুধু ডমরনগরে নয়, ভারতবর্ষের আরও বিশাল বিশাল নগরে বাররামাদের আবাসস্থল। গৌড়, চম্পকনগর, মগধ, বৈশালি—এসব নগরে চিরায়ুষ্মতীরা বাস করে। তারা নগরের শোভা। নারীদেহে যেমন অলংকার, নগরদেহে তেমনি বাররামা। রাজসভায় বা কোনো উৎসবের আসরে এই নগরলক্ষ্মীরা সুরসিক নাগরিকদের নাচে-গানে মুগ্ধ করে। আবার শয্যাসঙ্গিনী হয়ে নাগরিকদের দেহসুখ দেয়। এই রূপাদাসীরা শুধু মনোরঞ্জন আর দেহরঞ্জন করে ক্ষান্ত থাকে না। তাদের অন্য ভূমিকাও আছে। রাজার হয়ে গুপ্তচরের কাজও করে তারা।

এ শুধু আজকের ভারতবর্ষের ইতিহাস নয়। বৌদ্ধযুগে অম্বপালি নগরকন্যা ছিল। নৃত্যগীতে পারদর্শী, কবি এবং অসাধারণ রূপসী এই অম্বপালি রাজা বিম্বিসারের পুত্রকে ধারণ করেছিল নিজ পেটে। বারানসির বারাঙ্গনা শামা, বাসবদত্তা, রাজগৃহের গণিকা শালবতী বৌদ্ধযুগের বিখ্যাত দেহজীবিনী। রামায়ণ-মহাভারতের যুগেও গণিকাদের কদর ছিল। রামের অভিষেকে কুলগুরু বশিষ্ঠের নির্দেশে সজ্জিত বারাঙ্গনারা উপস্থিত ছিল। রাম বনবাসে যাবেন, নিরুপায় রাজা দশরথ পুত্রের বনবাসকালীন সময়কে সুখকর করার জন্য সারথি সুমন্ত্রকে বচনচতুরা বেশ্যাদের সঙ্গে নেওয়ার আদেশ দিয়েছিলেন। চৌদ্দ বছর বনবাস শেষে রাম অযোধ্যায় ফিরছেন, স্বর্গ থেকে অপ্সরারা রামের মনোরঞ্জনের জন্য তাঁর চারপাশে সমবেত হয়েছিল। কুরুদের সঙ্গে পাণ্ডবদের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ হবে। পাণ্ডবরা প্রস্তুতি নিচ্ছে কৌরবদের বিরুদ্ধে। পাণ্ডবসেনাদের সঙ্গে যুদ্ধক্ষেত্রের উদ্দেশে রওনা দিল গণিকারা। সৈন্যদের দেহসুখেরও যে প্রয়োজন আছে। দুর্যোধন দ্বৈতবন আক্রমণ করতে চলেছে; সঙ্গে যাচ্ছে বেশ্যা, স্তুতিপাঠক, মৃগয়াজীবী। শ্রীকৃষ্ণ আসছেন কৌরবদের কাছে হস্তিনাপুরে, শান্তি স্থাপনের উদ্দেশ্যে। রাজা ধৃতরাষ্ট্র তাঁর অভ্যর্থনার জন্য পুত্রদের সঙ্গে বারাঙ্গনাদেরও যেতে আদেশ দিলেন। গান্ধারী গর্ভবতী হয়েছেন। ধৃতরাষ্ট্রের দেহক্ষুধা মেটাতে অক্ষম গান্ধারী। ধৃতরাষ্ট্র শূন্যশয্যায় কাতর এবং অস্থির। কোনো অসুবিধা নেই। বাররামারা এসে গেল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ধৃতরাষ্ট্রের প্রয়োজন মেটাতে। বিরাট রাজা যুদ্ধজয়ের পর দেশে ফিরলেন, উৎসবের আয়োজন করলেন তিনি। ওই উৎসবের প্রধান আকর্ষণ বারস্ত্রীরা। রামায়ণে উল্লেখ আছে, সমাজের বিলাসসামগ্রীর অন্যতম এই রূপজীবিনীরা। রাজসভায় বা ধনীগৃহে সমৃদ্ধির প্রতিমূর্তি হিসেবে বারাঙ্গনাদের গণ্য করা হতো। মঙ্গল কামনায় বা নিজেদের শক্তিমত্তার পরিচয় জাহির করার জন্য প্রাচীনকালে রাজরাজড়া যজ্ঞ করতেন। যজ্ঞের পুরোহিতকে দক্ষিণা দিতে হতো। শয়ে শয়ে হাজারে হাজারে নারীকে দক্ষিণা হিসেবে পুরোহিতদের প্রদান করা হতো। বাছা বাছা রূপসীদের সঙ্গে নিত পুরোহিতরা। অন্যরা ক্রীতদাসী হিসেবে বা বেশ্যা হিসেবে লোকালয়ে, হাটে-বাজারে ছড়িয়ে পড়ত। তা ছাড়া যুদ্ধে বন্দী করে আনা হতো মেয়েদের। রাজা-রাজন্যরা নিজেদের পছন্দমতো কিছু মেয়েকে বেছে নিতেন নিজেদের দেহসুখের জন্য। বাকিদের ঠেলে দেওয়া হতো বারাঙ্গনাপল্লিতে। এভাবে নগরে নগরে বারবনিতাপল্লি গড়ে উঠেছে যুগ থেকে যুগান্তরে। গঙ্গা-করতোয়াসংলগ্ন ভূমিতে বারাঙ্গনারা বহু বহু প্রাচীনকাল থেকে কামলোভীদের তৃপ্তি দিয়ে আসছে। কালিন্দীলগ্ন ডমরনগরের এই বারাঙ্গনাপল্লিটিও তা-ই। তারাও বহুকাল আগে থেকে স্বদেশি এবং বিদেশি অতিথিদের আদর-আপ্যায়ন করে আসছে।

ডমরনগরের এই বারাঙ্গনাপল্লির মেয়েরা জানে, তারা ভোগের সামগ্রী। ভোগের পর আবার ছুড়ে ফেলারও। মোহনা, কুন্তি, জানকি, অলকা, সুবর্ণা, দময়ন্তী, উর্বশী, অঙ্গনা, সবাই জানে, সমাজে তারা আদরণীয়। তবে এই বাস্তব সত্যকেও এরা ভুলে যায় না যে সমাজ-মানুষদের কাছে তাদের কদর তত দিন পর্যন্ত, যত দিন তাদের গতরে যৌবন আছে, তাদের চোখে ছলাকলার কটাক্ষ আছে, মুখে অতিথিদের মন বিদ্ধ করার বাক্যবাণ আছে। এই পল্লির বারাঙ্গনারা এ কথাটি ভালো করে জানে যে তাদের ব্যবসার প্রধানতম মূলধন তাদের দেহ। তাই তারা স্তনের পরিচর্যা করে, অধরের পরিচর্যা করে। দর্পণের সামনে দাঁড়িয়ে কটাক্ষের ধার পরখ করে। শরীরকে চাঙা রাখার জন্য, দেহচর্মকে চেকনাই করে গড়ে তোলার জন্য তারা মহুল মদ গরম করে শরীরের ভাঁজে ভাঁজে ডলে। উষ্ণ মদে গতরের ব্যথাও সারে। পুরুষেরা তো বারাঙ্গনাদের কাছে এসে পশুতে রূপান্তরিত হয়ে যায়! তাদের হিতাহিত জ্ঞান লোপ পায়, স্থান-কাল-পাত্র ভুলে যায় তারা। চরম সুখের আগ মুহূর্ত পর্যন্ত তারা উন্মাদ হয়ে থাকে। পশুরও হিতাহিত জ্ঞান আছে। মিলিত হওয়ার আগে পুরুষপশুরা নারীপশুর আশপাশে ঘুরঘুর করে, তাদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মনোযোগ আকর্ষণ করার আপ্রাণ চেষ্টা করে, বিপুল আদরে-সোহাগে ভরিয়ে দিয়ে নারীপশুটিকে মিলনে সম্মত করায়। মিলনের সময়েও পশ্বাচার করার উপায় নেই। ওই সময় নারীপশুটি বেঁকে বসলে মিলনের চরম সুখ থেকে বঞ্চিত হতে হয় পুরুষপশুটিকে। এই সুখে নারীপশুটির পূর্ণ সম্মতি প্রয়োজন। কিন্তু এই বারাঙ্গনাপল্লিতে নারীসম্মতির প্রয়োজন নেই, নারীদের শারীরিক সুস্থতাও উপেক্ষিত হয় পুরুষদের কাছে। মিলনের আগে পুরুষেরা নারীশরীর বিমর্দনে মগ্ন থাকে। সেই বিমর্দন নারীটিকে সুখ দিচ্ছে, না ব্যথা দিচ্ছে—সেদিকে লক্ষ করার প্রয়োজন অনুভব করে না অধিকাংশ অতিথি। তাই দিন শেষে বা রাত্রি অবসানে নারীরা তাদের শরীরে অশেষ ব্যথা অনুভব করতে থাকে। এ সময় বারাঙ্গনারা উষ্ণ মহুল মদের আশ্রয় নেয়।

দীর্ঘ সময় ধরে মদের গন্ধ শরীরের আনাচে-কানাচে লেগে থাকে। ওই গন্ধে গ্রাহকদের দেহমন আনচান করে ওঠে। সন্ধ্যা লাগো লাগো সময়ে বারাঙ্গনাপল্লির দুয়ারে দুয়ারে দাঁড়িয়ে পড়ে চিরায়ুষ্মতীরা। হাতে হাতে দীপাধার। সর্ষপসিক্ত তুলোর সলতে সেই দীপাধারে মৃদু আলো ছড়ায়। নানা আকারের দীপাধার। সব দীপাধারই কারুকার্যময়। নানা ধাতুতে নির্মিত এই দীপাধারগুলো। পিতল, রুপা, লৌহ, তামা, এমনকি কারও কারও হাতে স্বর্ণের দীপাধারও। মৃত্তিকানির্মিত দীপাধার নিয়েও যে কেউ কেউ দাঁড়ায় না, এমন নয়। বিগতযৌবনা, দৈহিকভাবে অনাকর্ষণীয় বারাঙ্গনারা, যাদের অতিথি কম, যাদের দাবি নগণ্য, তারাই মাটির প্রদীপ নিয়ে সংকুচিতভাবে দ্বারের একপাশে দাঁড়িয়ে থাকে।

যৌবনবতী চিরায়ুষ্মতীদের তাম্বুলচর্চিত অধর। সজ্জিত মুখমণ্ডলে দীপের মৃদু আলো তির্যকভাবে পতিত। তখন এদের স্বর্গীয় বলে ভ্রম হয়; মনে হয়, এরা যেন একেকজন অপ্সরা—উর্বশী, মেনকা, ঘৃতাচী, গিরিকা, প্রম্লোচা।

বারাঙ্গনাদের সন্তান হতে নেই। জানকি বলে, 'মোরা সন্তান দিয়ে কী করব। সন্তানবতী বারাঙ্গনাদের কোনো কদর নাই গ্রাহকদের কাছে। সন্তান মোরাদের বোঝা।' কিছুক্ষণ থেমে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে জানকি আবার বলতে থাকে, 'তার পরও তো মোরাদের সন্তান হয়। তখন উভয় সংকট—সন্তান পালব, না দেহ বেচব? সন্তান পালনের চেয়ে দেহবেচা মোরাদের কাছে জরুরি। দেহ না বেচলে খাব কী? কী খাব, বল তোরা?' শেষের বাক্যটি কাদের উদ্দেশ করে বলল জানকি, বোঝা গেল না। তার সামনে জড়ো হওয়া বারাঙ্গনা, না সমাজের দেহলোভী মানুষকে উদ্দেশ করে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাদের অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থানের নিশ্চয়তা চাইছে জানকি, তা তার চোখমুখের অভিব্যক্তি দেখে বোঝার কোনো উপায় নেই। প্রথম দিকের কথাগুলো বারাঙ্গনাদের দিকে চেয়ে বললেও শেষের কথাটি ফটকের দিকে তাকিয়ে বলল জানকি।

তার পরও সন্তান হয় এদের। পুত্রসন্তানের চেয়ে কন্যাসন্তানেই সুখ বাররামাদের। পুত্রসন্তান দিয়ে কী করবে বারবনিতারা? যৌবনপ্রাপ্ত হলে এই পুত্ররা চোর-বাটপার-দালাল-খুনিতে রূপান্তরিত হয়। নিষ্কর্মা এই যুবক দল বারাঙ্গনাপল্লির আতঙ্কে পরিণত হয়। তার চেয়ে কন্যাসন্তান ভালো। সন্তান যদি বিয়োতে হয়, কন্যাসন্তান বিয়োনোই শ্রেয়। বিগত যৌবনে এই কন্যাসন্তানই বারাঙ্গনাদের মূলধন। যুবতী কন্যারা বিগতযৌবনা মাকে আশ্রয় দেয়, দু'বেলা দু'মুঠো অন্ন জোগায়।

AMARBOI.COM

তিন

সেই সন্ধ্যায় আট-দশজনের একটি সৈন্যদল ঘোড়ার খুরে ধূলি উড়িয়ে বারাঙ্গনাপল্লির ফটক দিয়ে প্রবেশ করল। মুখে তাদের হইহই হট। বারাঙ্গনাপল্লির সবাই বুঝে গেল, চণ্ডক আসছে। চণ্ডক আসছে মোহনার ঘরে। ছোটখাটো রাজন্য যারা আসে এই পল্লিতে, তারা জানান দিয়ে আসে না, নীরবে আসে। চণ্ডক শক্তিধর রাজন্য। সুতরাং, এই পল্লিতে তার আগমনবার্তা সর্বজনশ্রুত হওয়া চাই। তাই সে জানান দিয়ে আসে এই পল্লিতে। বারাঙ্গনাপল্লিগমনকে সে হীন চোখে দেখে না। ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যে রাজারা বারাঙ্গনাদের লালন করে। কৈবর্তরাজ ভীম একনিষ্ঠ, এক স্ত্রীতে তাঁর সকল সন্তুষ্টি। বারাঙ্গনা লালনের বিষয়টি নিয়ে তিনি ভাবেনও না। কিন্তু তিনি না ভাবলে কী হবে, রাজধানীগুলোর প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী বাররামাদের প্রশ্রয় দিতেই হয়েছে। তাঁকে অনুসরণ করে অধিকাংশ রাজপুরুষ বারবনিতাগমন থেকে নিজেদের সংযত রাখলেও চণ্ডক তা মানেনি। চণ্ডক ডমরনগরের এই বারাঙ্গনাপল্লিতে আসে, রাজা ভীমের তা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অজানা নয়। ব্যাপারটি পছন্দ না হলেও চণ্ডকের শক্তিমত্তা ও মেধার কারণে চণ্ডকের বাররামাগমনের ব্যাপারে তেমন করে জোরালো আপত্তি করেননি ভীম। ব্যাপারটি যে তিনি জানেন, তা-ও কোনো রাজন্যকে বুঝতে দেননি। এমনকি চণ্ডককেও ঘুণাক্ষরে টের পেতে দেননি রাজা ভীম। তাঁর গুপ্তচরেরা বরেন্দ্রির সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। সেদিন গুপ্তচর প্রথম এসে জানাল, সমরনায়ক চণ্ডক আজ বারাঙ্গনাপল্লিতে প্রবেশ করেছে। শুনে রাজা গম্ভীর হয়ে গিয়েছিলেন, মুখে কিছু বলেননি। যদিও তাঁর মুখে সামান্য চিন্তার রেশ ভেসে উঠেছিল, তবে তা সামান্য সময়ের জন্য। সামান্য গুপ্তচরের পক্ষে রাজার চেহারার ভাষা বোঝার কথা নয়।

ঘোড়ার খুরের শব্দে জানকি বুঝে গেছে, চণ্ডক আসছে। অলকাকে দিয়ে মোহনার কাছে দ্রুত সংবাদ পাঠাল জানকি, 'চণ্ডক আসছে তোর ঘরে। নিজেকে তাড়াতাড়ি সজ্জিত করে রাখ।'

মোহনা নিজের দেহকে সাজিয়েই রেখেছিল। বেশ কদিন ধরে মোহনার মনে হচ্ছিল, চণ্ডক আসবে। অনেক দিন চণ্ডক আসেনি তার ঘরে। যেকোনো রাতে বা সন্ধ্যায় চণ্ডক এসে পৌঁছাবে তার দুয়ারে।

'কই, মোহনা কই? আমার মোহনা গেল কোথায়?' বলতে বলতে দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকল চণ্ডক।

রঞ্জিত অধর আর লোভনীয় দেহবল্লরী নিয়ে এগিয়ে এল মোহনা। 'এই তো আমি' বলেই চণ্ডকের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ল মোহনা।

মৃদু ধাক্কায় মোহনাকে নিজের বুক থেকে বিচ্ছিন্ন করে চণ্ডক বলল, 'আমার দিকে পেছন ফিরে দাঁড়াও মোহনা, চোখ বন্ধ করো।'

মোহনা ব্যাপারটি বোঝার আগেই চণ্ডক দুহাতে মোহনাকে ঘুরিয়ে দিল। বলল, 'আমি না বলা পর্যন্ত চোখ খুলবে না।' তারপর পোশাকের অভ্যন্তর ভাগ থেকে হারটি বের করে মোহনার গলায় পরিয়ে দিল চণ্ডক। তাকে নিয়ে গেল দর্পণের সামনে। তারপর বলল, 'এবার চোখ খোলো, মোহনা।'

চোখ খুলতেই হারের ওপর নজর পড়ল মোহনার। মোহনা স্তব্ধ, নির্বাক।

চণ্ডক বলল, 'কিছু বলছ না যে?'

মোহনা স্তব্ধতা ভেঙে বলল, 'কী বলব আমি! এত দামি হার! এই মহামূল্যবান হার আমার মতো সামান্য বারাঙ্গনার গলায় মানায়?'

'তুমি সামান্য নও। তুমি অসামান্য, অতুলনীয় তুমি।'

'কী যে বলো!' কম্পিতস্বর মোহনার।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'কাঁপছ কেন?

'উত্তেজনায়।'

'কিসের উত্তেজনা?'

'হার পাওয়ার উত্তেজনা।'

এবার অহংকারী কণ্ঠে চণ্ডক বলল, 'নবরত্ন হার এটি। যুবরাজের পত্নীর গলায় ঝোলার কথা ছিল এটির।' একটুক্ষণ চুপ করে থেকে চণ্ডক স্বগত কণ্ঠে বলল, 'যুদ্ধ করব আমি, রক্ত দেব আমি, পরামর্শ দেব আমি। আর মূল্যবান নবরত্ন হার ঝোলাবে পাষণ্ড শর্বের পত্নী! তা হবে না। চণ্ডকের প্রিয়তমার গলাতেই শুধু এ হার মানায়।'

বুকে মাথা রেখে মোহনা জিজ্ঞেস করে, 'বিড়বিড় করে কী বলছ তুমি? কিছুই তো বুঝছি না।'

'তোমার অতসব বোঝার দরকার নেই। বলো, কেমন লাগছে তোমার হারটি পরে?'

মোহনা চণ্ডকের প্রশ্নের কোনো জবাব না দিয়ে চণ্ডকের ঠোঁটে নিজের পুরুষ্টু অধর ডুবিয়ে দিল।

ডমরনগরের বারাঙ্গনাপল্লির কারও যেদিন এই পেশায় হাতেখড়ি হয়, সেদিন ভোরসকালে নাপিতানি এসে নখ রঙে দিয়ে যায়। হাত-পায়ের দশ আঙুলের নখে খুর ছোঁয়াতে ছোঁয়াতে নাপিতানি বলে, 'পুরুষরা যাতে তোর এই পায়ের নখে বাঁধা থাকে রামা, তোর হাতের নখের আঁচড়ে আঁচড়ে রক্তাক্ত হয়েও যেন পুরুষরা প্রফুল্ল বোধ করে, এই কামনা মোর।'

তারপর আসে চুল বিন্যাসকারিণী। প্রৌঢ়া বারাঙ্গনা। মেয়েটির মাথায় ঘষে ঘষে সুবাসিত তেল মাখে সে। তারপর শরীর উদোম করে। উষ্ণ মহুল মদ শরীরের নানা আড়ে যত্নের সঙ্গে ডলতে থাকে। তেল এবং মদ মাখানো শেষ হলে মেয়েটিকে কালিন্দীতে নিয়ে যাওয়া হয়। গলাজলে দাঁড় করিয়ে গাত্রমার্জন করে অন্য বারাঙ্গনা। তারপর ভালো করে স্নান করানো হয় সেই অক্ষতযোনি মেয়েটিকে। ঘরে এনে পরিচ্ছন্ন বিছানার মাঝখানে বসানো হয় তাকে। নতুন কাপড় পরানো হয়। চোখে লাগানো হয় গাঢ় কাজল। পায়ে লাগানো হয় আলতা। তারপর উলুধ্বনি দিতে দিতে তার মাথায় ধানদূর্বা দেওয়া হয়। এই দিন কিশোরী বাররাম্যাটির কদর অনেক বেশি এই পল্লিতে। ওর হাত ধরেই যে লক্ষ্মী ঢুকবে এই বারাঙ্গনাপল্লিতে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মোহনার স্পষ্ট মনে আছে, এই বৃত্তিতে ব্রতী হওয়ার প্রথম দিনের কথা। সদ্য রজঃস্বলা হয়েছে সে। ভয়ে কম্পিত মোহনা। এ বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ সে। জানকি বোঝাল, 'ও কিছু না রে বিটি। সব মেয়ের ওই রকম হয়, মাসে মাসে হয়। তোহারও হয়েছে। জীবনে প্রথম হয়েছে বলে তোর ডর লাগছে। পরে সব সয়ে যাবে। আজ থেকে বিটি তুই উপযুক্ত হলি।'

ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে মোহনা। বোকা বোকা কণ্ঠে জিজ্ঞেস করে, 'কিসের উপযুক্ত, মা?'

'এখন বুঝবি না, বিটি। রাতে বুঝবি।' বলেই তদারকিতে মনোনিবেশ করল জানকি।

বামুনঠাকুর এসে গোধূলিলগ্নে বিয়ের আয়োজন করলেন। বাররামারা ভিড় করল জানকির ঘরে। মোহনার বর কে? কিসের সঙ্গে বিয়ে হচ্ছে মোহনার? নানা প্রশ্ন আগতাদের কণ্ঠে।

জানকি বলল, 'বঁটির সঙ্গে বিয়ে হবে লো মোহনার।'

মোহনা বিয়ের মাহাত্ম্য বোঝে না। এ পাড়ায় আসার পর থেকে কোনো বিয়ের আসর দেখেনি মোহনা। এই বারাঙ্গনাপল্লিতে বিয়েটিয়ে হয় না। বিয়ের পর বাসররাতে শয্যার ওপর স্বামীতে-স্ত্রীতে যা হয়, তা-ই হয় এই পল্লিতে। ও-কাজ করার জন্য এখানে স্বামী-স্ত্রী হতে হয় না। এমনি এমনি হয়ে যায় ও-কাজ। কড়ি দিলেই এই পল্লির যেকেউ যে কেউ স্ত্রী হয়ে যায় কিছু সময়ের জন্য।

সেদিন বামুনঠাকুর মোহনার সিঁথিতে চিকন করে সিঁদুর দিলেন, গলায় পরালেন গাঁদার মালা। তারপর বঁটিটিকে মোহনার সামনে বসিয়ে উচ্চারণ করলেন—ওঁ স্বাহা, ওঁ স্বাহা। অনেকক্ষণ কী কী যেন মন্ত্র পড়ে গেলেন বামুনঠাকুর। তারপর উচ্চস্বরে বললেন, 'বিয়ে সম্পন্ন হলো, জানকি মা। দক্ষিণা দিয়ে আমাকে বিদেয় করো, মা জননী।'

বঁটির সঙ্গে বিয়ের পরে গভীর ভাবনায় পড়ল মোহনা। বিয়ে যদি হতেই হবে, তাহলে বঁটির সঙ্গে কেন? অলকা মাসির কাছে মোহনা শুনেছে, মানুষে মানুষে বিয়ে হয়, মানে নারীতে-পুরুষে বিয়ে হয়। বঁটির সঙ্গে মানুষের বিয়ে হয় কী করে? মোহনার ভেতরে জিজ্ঞাসাটি আকুলিবিকুলি করছিল। একসময় মোহনা জানকিকে জিজ্ঞেস করে বসল, 'লোহার সঙ্গে বিয়া কেনে, মা, মানুষের সাথে নয় কেনে?'

'মানুষের সাথে মোরাদের বিয়া হতে নাই। মানুষের সাথে বিয়া হলে তো শুধু একজনের বউ হয়ে যেতে হয়। এ রকম বিয়া যাদের হয়, তারা কুলবধূ। মোরা যে বারবনিতা। মোরা যে সবার স্ত্রী। তাই একজনের সঙ্গে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মোরাদের বিয়া হতে নাই। এ ছাড়া মোরা চিরায়ুষ্মতী। মোরাদের যুগ যুগ ধরে বেঁচে থাকতে হয়। তাই অমর কিছুর সাথেই মোরাদের বিয়া হওয়া উচিত। তোর বিয়াও হয়েছে তা-ই লোহার তৈরি বঁটির সাথে।' আস্তে আস্তে বলেছিল জানকি।

'কেনে মা?' মোহনার কণ্ঠ থেকে প্রশ্নটি আবার বেরিয়ে আসে।

'শুন বিটি, মোর সকল কথা বুঝার বয়স তোর এখনো হয়নি। তার পরও বলি, এই পাড়ার অক্ষতযোনিদের গাছ বা লোহার সাথে বিয়া দেওয়া নিয়ম,' জানকি বলে।

মোহনা বলে, 'গাছ কেনে, মা?'

এবার জানকি বলে, 'গাছ তো অমর, লোহারও ক্ষয় নাই। এক গাছ মরল তো তার বীজ থেকে আরেক গাছ জন্মাল। গাছ চিরায়ু। বংশধারা রক্ষা করে গাছরা যুগ থেকে যুগান্তরে বেঁচে থাকে।'

'আর লোহা!' মোহনা জানতে চায়।

জানকি বলে, 'লোহারও ক্ষয় নাই। গাছের মতো লোহাও অমর-অক্ষয়।' তারপর একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে জানকি। চোখমুখ করুণ করে আবার বলতে থাকে, 'বারবধূরাও অমর, চিরায়ুষ্মতী তারা। এক মোহনা গেলে, আরেক কাঞ্চনা আসে। এক কাঞ্চনার অবর্তমানে আরেক উর্বশী এসে স্থান করে নেয় এই বারবনিতাপল্লিতে। জায়গা খালি থাকে না কখনো। এই জন্য অমর জিনিসের সাথে মোরাদের বিয়া হয়। তোহারও হয়েছে।'

মোহনা জানকির সব কথা ভালো করে বুঝে উঠতে পারে না। তবে এটুকু সে বুঝতে পারল—এই বঁটিটি, যার সঙ্গে তার বিয়ে হয়েছে, আজ থেকে তার স্বামী। শয়নে-জাগরণে আজ থেকে এই বঁটিটিই তার জীবনের একমাত্র অবলম্বন। সেই থেকে বঁটিটিকে সঙ্গে সঙ্গে রাখে মোহনা। ভাবে, ওই তো মোর স্বামী।

চণ্ডক জানকির কাছ থেকে এই মোহনার কুমারিত্ব কিনে নিয়েছিল। উচ্চমূল্যে। প্রথম রাতে আধা পণ কড়ি দিয়ে মোহনার ঘরে ঢুকেছিল চণ্ডক। সাঁঝবেলার বিয়ের গাঁদার মালা তখনো মোহনার গলায় ঝুলছিল। তাজা গাঁদা। একধরনের ঘোরলাগা গন্ধ ছড়াচ্ছিল গাঁদাগুলো। অগুরু চন্দনের সুবাসের সঙ্গে গাঁদার গন্ধ মিশে বাতাসকে করে তুলেছিল মাদকতাময়। সেই বাতাস চণ্ডকের রক্তকণিকায় ঝড় তুলেছিল, কামের ঝড়। রাতের অতিথি চণ্ডক কুমারী ফুলের মালা ছিঁড়তে পছন্দ করে। চণ্ডক জানে, এ মালা নিছক মালা নয়, মোহনার অক্ষতযোনির প্রমাণও। অক্ষতযোনিতে যুবা, প্রৌঢ়,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বৃদ্ধ—কার না আগ্রহ! মদিরারক্তিম চোখে চণ্ডক মোহনার ঘরে ঢুকেছিল সে রাতে। মোহনাকে বুকের ঠিক মধ্যিখানে টেনে নিয়েছিল। মোহনার গলার মালায় হাত বোলাতে বোলাতে বলেছিল, 'এই মালা আমার, এই মোহনা আমার। এর ঘরে আর কাউকে ঢুকতে দিয়ো না তোমরা।' তারপর চিৎকার করে মত্ত কণ্ঠে বলেছিল চণ্ডক, 'শুনছ তুমি জানকি, এই মোহনা আজ থেকে শুধু আমার হয়ে থাকবে। কেউ এর দিকে নজর তুলবে না। কেউ যদি এর দিকে হাত বাড়ায়, তাহলে তার মৃতদেহ ভাসবে ওই কালিন্দীজলে।' সেই রাত থেকে মোহনার অধিকার রইল শুধু চণ্ডকের হাতে।

আঁধার-সকালে চণ্ডক চলে গেল। বিরাট পালঙ্কের মাঝখানে পড়ে থাকল দোমড়ানো-মোচড়ানো গাঁদার মালাটি। মালাবিচ্ছিন্ন অনেক গাঁদা বিছানার এপাশ থেকে ওপাশ পর্যন্ত ছড়ানো। আর সেই ছড়ানো দোমড়ানো ফুলের মাঝখানে পড়ে থাকল মোহনা—মর্দিত, দলিত, শোষিত মোহনা। এ মোহনা এখন অক্ষতযোনির মোহনা নয়। দুপাড় ভাঙা নদী।

সকালে, আলো ফুটি ফুটি সময়ে বড় যত্ন করে মোহনাকে কালিন্দীজলে স্নান করাতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। বড় ব্যথা উঠতি স্তনে আর গুপ্তস্থানে। মোহনার শরীরের কোনো আড় অস্পর্শিত থাকেনি। চণ্ডক মোহনার কচি শরীরের ভাঁজে ভাঁজে নিজের পৌরুষত্বের প্রমাণ রেখেছে। বারবার দলিত-মথিত করেছে মোহনার সর্বাঙ্গ। জলজে দাঁড়িয়ে মোহনা কঁকাচ্ছিল। কনকনে ব্যথা যে সর্বশরীরে।

জানকি বলেছিল, 'এই ত শুরু মোহনা। এভাবেই এই পল্লির মেয়েদের দিন কাটে, রাত কাটে। তব পুরুষ মানুষ নয়, পশুদের পাল্লায় পড়ে এ পাড়ার অনেক মেয়ের শরীর ভাগাড়ে পরিণত হয়। তোহার ত ভাগ্য ভালো। চণ্ডকের নজর পড়েছে তোহার ওপর। অন্য কেউ আসতে পারবে না তোহার ঘরে, নজর দিতে পারবে না তোহার দিকে। তার পরও বলি, তোহার মন শক্ত করো, মোহনা।'

উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা মোহনা। জালিকদের ঘরে ফরসা রঙের নারী নেই। ফরসা রঙটা বামুনদের জন্য। ক্ষত্রিয়-বৈশ্য নারীরাও ফরসা হয়। শূদ্রের শূদ্র নমশূদ্র। চাঁড়াল, মুচি, দুলিয়া, কেওড়া, ধীবর—এরা নমশূদ্র। নমশূদ্রের কন্যাদের ফরসা হতে নেই—এটাই যেন বিধির বিধান। মোহনাও তাই ফরসা নয়, শ্যামলা। তবে এ শ্যামলার সঙ্গে ফরসা রঙের একটু আভা যেন মিশে আছে। এই ফরসা আভাটাই মোহনার শ্যামলা রংকে রসময় করে তুলেছে।

মোহনার চুল কোঁকড়ানো। কোঁকড়া চুল খুব বেশি লম্বা হয় না, বিপুল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হয়। কিন্তু মোহনার চুল নিয়ম মানেনি। তার চুল বেশ লম্বা। কোঁকড়ানো লম্বা বিপুল চুল মোহনার পিঠজুড়ে। ছিপছিপে শরীর তার। তার চোখেমুখে গ্রামজীবনের শৈশব লেপ্টে আছে। সেই ছোট্ট বয়সটিতে মোহনা গ্রাম ছাড়তে বাধ্য হয়েছিল। গ্রামের শস্যময় খেত, শিশিরভেজা মেঠোপথ, কলাপাতার কচি রং, পাখি ডাকা ভোর কবে ফেলে এসেছে মোহনা! কিন্তু এখনো তার চোখেমুখে মেঠোপথের শিশিরসিক্ত ঘাসের কোমলতা, তার গায়ের রঙে কচি কলাপাতার সবুজাভা। মোহনা সর্বাঙ্গশোভনা।

কালিন্দী এগিয়ে যেতে যেতে যেখানে বাঁক নিয়েছে, সেই বাঁকে জেলেপল্লি। ওই ধীবরপল্লিটির নাম গাঙ্গী। গাঙ্গীর মানুষের ঘরে কোনো অভাব ছিল না। কালিন্দীর পাড় ঘেঁষেই পল্লিটি। গাছগাছড়া আর ছোট ছোট ফসলিখেতে সাজানো এই পল্লিটি যেন ছবির মতন সুন্দর। সকালে পুরুষেরা যায় নৌকাজাল নিয়ে কালিন্দীতে, নারীরা ব্যস্ত হয়ে পড়ে ঘরকন্নায়। শিশুরা মনের আনন্দে খেলা করে অথবা ঘুরে বেড়ায় এখানে-ওখানে। তিন বছরের মোহনাও খেলছিল কালিন্দীপাড়ে, অন্য কজন শিশুর সঙ্গে। ওখান থেকেই মোহনাকে চুরি করে এনেছিল সনকা। ওখানে, ওই গাঙ্গীর মা-বাবার ঘরে মোহনার কী নাম ছিল, সনকা জানে না। জানকিই রেখেছিল চুরি করে আনা মেয়েটির নাম—মোহনা। সনকার কাছ থেকে জানকি মোহনাকে কিনে নিয়েছিল। সে সময় সনকাদের মতো যৌবনহারা বারাঙ্গনারা গাঁয়ে গাঁয়ে ভিক্ষুক সেজে বা বেদের মেয়ে সেজে ঘুরে বেড়াত। সুযোগ পেলে মোহনাদের মতো বালিকাদের চুরি করে নিয়ে আসত। তারপর বিক্রি করে দিত বারাঙ্গনাপল্লিগুলোতে। শুধু ডমরনগর নয়, বৈশালি, মগধ, চম্পকনগর, গৌড় প্রভৃতি নগরের অধিকাংশ বারাঙ্গনা এভাবেই সংগৃহীত হতো।

নিজের পেটের মেয়ের মতো করেই মোহনাকে লালনপালন করেছিল জানকি। একটু বড় হলে ছলাকলার তালিম দিয়েছিল। বাররামাদের চৌষট্টিকলা জানতে হয়। মোহনা সব কটি কলাতে দক্ষ হয়ে না উঠলেও অনেকটাতে পারদর্শী হয়ে উঠেছিল। রজঃস্বলা হওয়ার আগেই ছলচাতুরীতে অনেকটা দক্ষ হয়ে উঠেছিল মোহনা। তারপর রজঃস্বলা, তারপর চণ্ডকের ডুবসাঁতার—মোহনার জলে। এরই মধ্যে মোহনার দেহভাষা আর মুখের ভাষার বিপুল পরিবর্তন হতে থাকল। দেহে চেকনাই, চোখে মদির কটাক্ষ, মুখের ভাষায় বিচক্ষণতা যুক্ত হতে থাকল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চার

বয়স্ক বিনিয়ুক্তক আর সনাতন সে সন্ধ্যাতেই ছুটে গিয়েছিল কোষাধ্যক্ষের কাছে। কোষাধ্যক্ষ তাদের নিয়ে গেল অর্থমন্ত্রীর কাছে। অর্থমন্ত্রী তাদের উপস্থিত করলেন রাজা ভীমের সামনে। ভীম স্থির চোখে তাকিয়ে আছেন বিনিয়ুক্তকের দিকে। বিনিয়ুক্তক থরথর করে কাঁপছে। কথা বলতে গিয়ে তার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে যাচ্ছে বারবার। শুধু অস্পষ্ট গোঁ গোঁ একটা আওয়াজ তার গলা থেকে বেরিয়ে আসছে। সনাতন রাজাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে কুঁজো হয়ে করজোড়ে দণ্ডায়মান। অর্থমন্ত্রী সনাতনকে কী যেন একটা ইশারা করলেন। সন্ত্রস্ত কণ্ঠে সনাতন বলল, 'মহারাজ, আমি সামান্য রাজকর্মচারী। সেনাপতি চণ্ডক অনেক ক্ষমতাবান শক্তিধর একজন রাজপুরুষ...।'

ভীম বললেন, 'রাজপুরুষ নয়, রাজানুগ্রহধন্য।'

'হ্যাঁ মহারাজ, রাজানুকম্পাধন্য সেনাপতি চণ্ডক। কিন্তু আজ যে আচরণ করলেন, তাতে মনে হলো তিনি রাজপুরুষ নন, লুণ্ঠনকারী।' গলা খাঁকারি দিয়ে বিনিয়ুক্তক বলল।

অর্থমন্ত্রী বললেন, 'প্রকৃত ঘটনাটি মহারাজের সামনে অনুপুঙ্খ বর্ণনা করো বিনিয়ুক্তক।'

ভীম বললেন, 'সংক্ষেপে বলো।'

বিনিয়ুক্তক কম্পিত কণ্ঠে ঘটনাটির আদ্যপ্রান্ত বর্ণনা করল। রাজা নিষ্পলক চোখে বিনিয়ুক্তকের দিকে চেয়ে থাকলেন। মহারাজের চোখমুখের অভিব্যক্তি দেখে তিনি ক্রোধান্বিত না বিস্মিত, বোঝা যাচ্ছে না। একপর্যায়ে বয়স্ক বিনিয়ুক্তক থেমে গেলে ভীত কণ্ঠে সনাতন বলে উঠল, 'আমাদের কোনো দোষ নেই, মহারাজ। হারটি কেড়ে নেওয়ার পর মাননীয় বিনিয়ুক্তককে বন্দী করলেন সেনাপতি চণ্ডক। আর আমি তো সামান্য ব্যক্তি, ক্ষুদ্র শক্তির আমি চণ্ডকদেবের খোলা তরবারির সামনে দাঁড়িয়ে কী-ই বা করতে পারি?'

নির্বাক মহারাজ। উদাস চোখে সামনের দিকে তাকিয়ে আছেন। উজ্জ্বল আলো নেই এ ঘরে। দিনের বেলাতেই এই কক্ষে মন্ত্রণাসভা বসে। চারদিকে আলো-বাতাসের ছড়াছড়ি তখন। রাতের বেলা রাজকার্যে এ কক্ষটি ব্যবহৃত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হয় না। তাই আলোর তেমন ব্যবস্থা নেই এ কক্ষে। রাজাদেশে সাময়িকভাবে আলোর মশাল জ্বালানো হয়েছে। একটু দূরে মশালটি দপদপ করে জ্বলছে। বেশ কিছুক্ষণ জ্বলার ফলে মশালে আলোর পরিমাণ কমে আসছে। ম্লান আলোতে ভীমের চেহারাকে হঠাৎ ভীষণাকার বলে মনে হলো সনাতনের। মহারাজ তার কথায় কোনোরূপ সাড়া না দেওয়ায় সনাতন আরও ভয় পেয়ে গেল। কাঁপা কাঁপা গলায় সে আবার বলতে শুরু করল, 'কার জন্য এই নবরত্ন হারটি আনা হয়েছে জানতে চাইলেন চণ্ডক। হারটি দেখার জন্য পীড়াপীড়ি শুরু করলেন। বিনিযুক্তক মশাই আপনার আদেশ পালনে বাধ্য নই বলাতে সেনাপতি চণ্ডক তরবারি কোষমুক্ত করলেন এবং পাশে রক্ষিত সিন্দুকে কোপ দিলেন।'

মহারাজ ভীম বাঁ হাত তুলে সনাতনকে থামিয়ে দিলেন। মুখে বললেন, 'থামো তুমি, সনাতন। ঠিক আছে, তোমরা এখন বাইরে যাও। অর্থমন্ত্রী বিশ্বমঙ্গল, আপনি একটু অপেক্ষা করুন।'

রাজাদেশ পেয়ে বিনিযুক্তক আর সনাতন কক্ষের বাইরে চলে গেল। মহারাজ ভীম এবার চোখ তুললেন অর্থমন্ত্রীর দিকে। বললেন, 'চণ্ডক এত বড় অন্যায় করার সাহস পেল কোথা থেকে? আমি স্তম্ভিত হয়ে গেছি, বিশ্বমঙ্গল!'

বিশ্বমঙ্গল বিনীতভাবে বললেন, 'আমি এর আগেও আপনার কাছে অভিযোগ করেছি, মহারাজ। অর্থের প্রতি চণ্ডকের প্রচণ্ড লোভ। রাজ-অর্থ অপচয় করতে চণ্ডক কার্পণ্য করে না। কারণে-অকারণে রাজকোষাগারে হাজির হয়। অর্থ আদায়ে মানসিকভাবে পীড়াপীড়ি করে। আগের অভিযোগগুলো আপনি আমলে না নেওয়ার ফলে চণ্ডক দুঃসাহসী হয়ে উঠেছে। আজ রাজকোষাগারে এত বড় আঘাত করতে তাই দ্বিধা করেনি চণ্ডক।'

'বিষয়টি আমি এখন বুঝতে পারছি, বিশ্বমঙ্গল। আমার প্রশ্রয়ে সে লোভী ও দুঃসাহসী হয়ে উঠেছে।' তারপর অনেকটা স্বগত কণ্ঠে ভীম বললেন, 'পাল রাজার সঙ্গে বরেন্দ্রির এখন সংঘর্ষের কাল। শুনেছি, বরেন্দ্রভূমি আক্রমণ করার জন্য রামপাল প্রস্তুতি নিচ্ছে। সামন্ত রাজাদের স্বাধীনতা আর অগাধ অর্থের লোভ দেখিয়ে একত্র করেছে। রামপাল নাকি সামন্তদের বলছে, "জয়ের পর কৈবর্তরাজ্য আপনারা ভাগ-বাঁটোয়ারা করে নেবেন, তাতে আমার কোনো দুঃখ হবে না। আমার যত দুঃখ ওই কৈবর্তদের উত্থান নিয়ে।" যাদের পায়ের জুতা বহন করার কথা, তাদের মাথায় আজ রাজমুকুট শোভা পাচ্ছে। এককাট্টা হয়েছে সামন্তরা। এ সময় চণ্ডকের সাহায্য আমার বড় প্রয়োজন, বিশ্বমঙ্গল।' বলতে বলতে হাঁপিয়ে উঠলেন ভীম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দম নিয়ে আবার বলতে শুরু করলে অর্থমন্ত্রী বললেন, 'আপনি থামুন, মহারাজ। আপনার কষ্ট হচ্ছে।'

'আমাকে থামতে বলবেন না, মন্ত্রী। কষ্ট আমাকে পেতে দিন। চণ্ডককে আমি রাস্তা থেকে কুড়িয়ে এনে এই রাজপ্রাসাদে স্থান দিয়েছি। কষ্ট তো আমারই পাওয়া উচিত। আমি তো মানুষ চিনে উঠতে পারিনি, মন্ত্রী।' বড় একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভীম জিজ্ঞেস করলেন, 'এই হার নিয়ে চণ্ডক কী করেছে, বলতে পারেন?'

বিল্বমঙ্গল বললেন, 'পারি, মহারাজ। আমার কাছে যথার্থ সংবাদ আছে। বিনিযুক্তক আর সনাতন আমার কাছে পৌছানোর আগেই চণ্ডকের এই অপকীর্তির সংবাদটি আমার কাছে পৌছে গিয়েছিল। আমি তৎক্ষণাৎ গুপ্তচর লাগিয়েছিলাম চণ্ডকের পেছনে। গুপ্তচর আমাকে এই সংবাদ দিয়েছে যে, চণ্ডক ডমরনগরের বারাঙ্গনাপল্লির এক বারবনিতার গলায় এ হার ঝুলিয়েছে। মোহনা তার নাম।'

'মোহনা! চণ্ডকের বারাঙ্গনাপল্লিতে যাতায়াত আছে, কৃপাসিন্ধুর মাধ্যমে কিছুটা জানতাম। কার কাছে যায়, সেটা আমার জানা ছিল না। জানতে আগ্রহও জাগেনি আমার মধ্যে। চণ্ডক কি একগামী?' মহারাজ জিজ্ঞেস করলেন।

অর্থমন্ত্রী বললেন, 'আমার কাছে যতদূর সংবাদ আছে তাতে মনে হয়, চণ্ডক বহুগামী নয়, এক মোহনার কাছেই সে গমনাগমন করে। এবং তারই গলায় লুণ্ঠিত নবরত্ন হারটি ঝুলিয়েছে চণ্ডক।'

ভীম দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, 'শর্বদেব বড় আশা করে তার নববিবাহিতার জন্য হারটি আনিয়েছিল গুজরাট থেকে! ঠিক আছে, আপনি এখন যান, বিল্বমঙ্গল। ব্যাপারটি যতদূর সম্ভব গোপন রাখবেন। সংবাদটি প্রচারিত হলে আমার দুর্বলতাই প্রকাশ পাবে বেশি।' কিছুক্ষণের জন্য আনমনা হয়ে গেলেন মহারাজ ভীম। তারপর নিজেকে শুনিয়ে শুনিয়েই যেন বললেন, 'রাজকার্য পরিচালনায় দুর্বলতা, স্নেহান্ধের দুর্বলতা।'

'মহারাজ, যদি অভয় দেন একটি কথা জিজ্ঞেস করি?' বিল্বমঙ্গল বললেন।

ভীম বললেন, 'বলেন।'

'আপনি জেনেও কেন চণ্ডককে বেশ্যাগমনে বিরত রাখেননি?'

এ রকম প্রশ্নের মুখোমুখি হবেন, ভীম ভাবেননি। আমতা আমতা করে তিনি বিল্বমঙ্গলের উদ্দেশে বললেন, 'বিরত রাখতে চাইনি, এমন নয়। আকারে-ইঙ্গিতে তাকে সাবধান করা হয়েছে। কিন্তু সে তা শোনেনি। কঠোর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ব্যবস্থা নিইনি এই ভেবে যে, বিষয়টি জনগণের মধ্যে প্রকাশিত হয়ে গেলে রাজপরিবারের লজ্জার আর সীমা থাকবে না। ভেবেছি, একসময় চণ্ডকের বারাঙ্গনামোহ কেটে যাবে। সে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসবে। কিন্তু আমার ভাবনা যে সঠিক নয়, তা চণ্ডক আজ প্রমাণ করে ছেড়েছে। তার পরও আপনার কাছে আমার অনুরোধ, ব্যাপারটি গোপন রাখার ব্যবস্থা নিন।'

কিন্তু কথাটি গোপন থাকেনি। পরদিন সকালের মধ্যে শর্বদেবের কান পর্যন্ত চণ্ডকের নবরত্ন হার লুণ্ঠনের সংবাদটি পৌঁছে গিয়েছিল।

মহারাজ ভীমের তিন পুত্র—শর্ব, কপর্দী ও শম্ভু। শম্ভু বলশালী, ভীমাকৃতি সে। মহিষের শক্তি তার শরীরে। বড় বড় পাথর নিমেষেই সে ছুড়ে ফেলতে পারে দূরে। কপর্দী ভাবুকশ্রেণীর তরুণ। দার্শনিক চেহারা। রাজকার্য, যুদ্ধবিগ্রহ ইত্যাদির প্রতি তার কোনো আগ্রহই নেই। শাস্ত্রাদি নিয়ে তার সময় কাটে। শর্ব ভীমের বড় পুত্র। সুদর্শন। তার গায়ে কৈবর্ত রং। দীর্ঘদেহী। কাঁধ ছাড়ানো চুল তার। যেমন সুদর্শন, তেমনি সমরদক্ষ। তার বিচক্ষণতার মধ্যে প্রাচীনরা দিব্যোকের বিচক্ষণতাকে খুঁজে পায়। ধনুর্বিদ্যায় শর্বের দক্ষতার কথা বরেন্দ্রি ছাড়িয়ে পাল রাজ্য পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। অসি চালনায়ও সে পারদর্শী। ছোট ছোট যুদ্ধে শর্ব তার শক্তির প্রমাণ রেখেছে। মহারাজ ভীম বড় ভালোবাসেন এই শর্বকে। শর্বকে আদর করে শর্বদেব বলে ডাকেন।

মহিষী দেবলার টান বেশি কপর্দীর প্রতি। ধর্মজ্ঞ কপর্দী। দেবলা পুজো-আচ্চায় নিমগ্ন থাকেন। রামায়ণ-মহাভারত-গীতা পাঠ শুনতে ভালোবাসেন। কপর্দীর ডাক পড়ে। দেবলা বলেন, 'বাছা, শাস্ত্রকথা শোনাও, মহাভারতের কাহিনি শুনতে বড্ড মন চাইছে। ব্যাসদেব নাকি আমাদেরই জাতের মানুষ ছিলেন। তিনিই তো রচনা করেছেন মহাগ্রন্থ গীতা। আমার সামনে বসো। গীতার মাহাত্ম্য শোনাও আমাকে।'

কপর্দী মা-অন্তপ্রাণ। মায়ের আদেশ তার কাছে বেদবাক্যের সমতুল্য। গীতাসহ অষ্টাদশ পুরাণাদি পাঠ যে তাদের মতো ছোটজাতের করা নিষিদ্ধ, সেটা জানে কপর্দী, কিন্তু মানে না। এই নিষেধের কথা মাকে বলে না কপর্দী। যা মানে না, তা প্রচার করবে কেন? ভক্তিভরে মায়ের পাশে বসে কপর্দী। পাঠ শুরু করে :

'বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় নবানি
গৃহ্ণাতি নরোহপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণান্যন্যানি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সংযাতি নবানি দেহী ॥
নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ।
ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ ॥'

পাঠ শেষ করে কপর্দী মাকে জিজ্ঞেস করে, 'মা, এর অনুবাদটা শুনবে না?'

মা বললেন, 'বল বাবা, বল।'

কপর্দী পড়ে গেল :

'জীর্ণ বস্ত্র ছাড়ি পার্থ যেইরূপে নরে
অপর নতুন বাস পরিধান করে,
সেইরূপ তেয়াগিয়া জীর্ণ দেহখানি
পুনরায় নবদেহ ধরেন পরানি।
শস্ত্র নাহি পারে তারে করিতে ছেদন
অগ্নি কভু নাহি পারে করিতে দহন,
সলিলের শক্তি নাই আর্দ্র করিবারে
বায়ু কভু পারে নাকো তারে শোষিবারে।'

আর সেনাপ্রধান কঙ্কণ শম্ভুকে পছন্দ করেন। শম্ভুর শক্তিমত্তায় কঙ্কণ অভিভূত।

মহারানি দেবলার অনুরোধের চাপে পড়ে মহারাজ ভীম শর্বকে বিয়ে করিয়েছেন। ভীম চেয়েছিলেন, বিয়েটা আরেকটু পরে হোক। সমরজ্ঞানে আরেকটু পোক্ত হয়ে উঠুক শর্ব। তারপর বিয়ে। কিন্তু মহিষী দেবলা রাজি হলেন না। তাই মাস কয়েক আগে মহা ধুমধামে ভীম প্রথম পুত্র শর্বকে বিয়ে করিয়েছেন। শর্বদেব পিতার যেমন অনুরক্ত, মাতৃভক্তিও তার কম নয়। এই শর্ব নববিবাহিতা স্ত্রীর মনোরঞ্জনের জন্য পিতার অনুমতি নিয়ে নবরত্নখচিত হারটি আনার ব্যাপারে অর্থমন্ত্রীকে অনুরোধ করেছিল। হারটি আনাও হয়েছিল। কিন্তু চণ্ডকের কারণে হারটি রাজপুত্রবধূর গলায় না ঝুলে মোহনার গলায় ঝুলছে। সংবাদটি কানে পৌঁছালে প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ হলো শর্বদেব। শর্ব এমনিতে শান্ত প্রকৃতির, কিন্তু হার লুণ্ঠনের সংবাদটি তাকে প্রায় অপ্রকৃতিস্থ করে তুলল। কক্ষের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত পর্যন্ত ছটফট করতে করতে সে পায়চারি করতে লাগল। মাঝেমধ্যে ডান হাতটি উঠে যেতে লাগল তরবারির বাঁটে।

জিজ্ঞেস করে স্ত্রী, 'তোমাকে এমন অস্থির দেখাচ্ছে কেন? কী হয়েছে?'

শর্ব স্ত্রীর কাছে সত্য গোপন করতে চায়। বলে, 'কই, কিছু হয়নি তো!'

শর্বদেবের চোখে চোখ রেখে স্ত্রী বলে, 'নিশ্চয়ই কিছু হয়েছে। তোমার অস্থিরতা তা-ই প্রমাণ করছে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'দেখো, রাজপুত্র আমি। রাজকার্যে নানা ঝঞ্ঝাট। সব কথা তোমার না শোনা ভালো। রাজপ্রাসাদের বাইরের সংকট অন্দরমহলকে আন্দোলিত করুক—এ আমি চাই না,' শর্বদেব বলল।

রাজপুত্রবধূর বয়স কম হলে কী হবে, বুদ্ধিমতী। শর্বের ইঙ্গিত বুঝতে তার বিলম্ব হলো না। কাজের বাহানায় শর্বের সম্মুখ থেকে সে চলে গেল।

বেলা দ্বিপ্রহরের দিকে রাজপ্রাসাদের অলিন্দে শর্বের সঙ্গে চণ্ডকের দেখা হয়ে গেল। সকালেই মহারাজ ভীম ডেকে পাঠিয়েছিলেন চণ্ডককে। চণ্ডক তখন মত্ত। মোহনার ঘর থেকে দেহরক্ষীদের সহায়তায় নিজ ভবনে পৌঁছেছে চণ্ডক। তখন সে প্রায় বাহ্যজ্ঞানশূন্য। সংবাদবাহক রাজাদেশ তাকে শুনিয়ে গেলেও তখন তার পক্ষে তা পালন করা সম্ভব ছিল না। দুপুর নাগাদ মত্ততা কমে এলে দেহরক্ষীপ্রধান রাজাদেশটি তাকে আবার শোনাল। স্নানান্তে সজ্জিত হয়ে চণ্ডক রাজপ্রাসাদে এসেছে মহারাজের সঙ্গে দেখা করতে। রাজপ্রাসাদে চণ্ডকের অবাধ যাতায়াত। প্রফুল্লচিত্তে চণ্ডক অলিন্দ দিয়ে হেঁটে আসছিল। শর্বের মনে হলো, চণ্ডক যেন তাকে দেখে একটু বাঁকা হাসি হাসল। এমনিতে মন বিক্ষুব্ধ। সকাল থেকে অনেক কষ্টে নিজেকে সংযত করে রেখেছে শর্ব। কিন্তু চণ্ডকের বাঁকা হাসি তার সংযমের সব বাঁধ ভেঙে দিল।

উষ্ণ কণ্ঠে শর্ব বলল, 'চণ্ডক, দাঁড়াও।'

চণ্ডক গতি না থামিয়ে বলল, 'বলো, কী বলবে। আমার তাড়া আছে। মহারাজ আমাকে ডেকেছেন।'

'মহারাজের কাছে যাওয়ার আগে আমার প্রশ্নের জবাব দিয়ে যাও, চণ্ডক,' শর্বদেব বলল।

চণ্ডক থামল। চোখ কুঁচকে বলল, 'কী প্রশ্ন?'

'তুমি রাজকোষ থেকে কাল নবরত্ন হার লুণ্ঠন করেছ। কেন?' কেন শব্দটির ওপর প্রচণ্ড শ্বাসাঘাত করে জিজ্ঞেস করল শর্বদেব।

চণ্ডক নিস্পৃহ কণ্ঠে বলল, 'দুটো ভুল করলে তুমি। রাজকোষ থেকে নয়, বাণিজ্যপোত ভেড়ার স্থান থেকে। আর হ্যাঁ, লুণ্ঠন করিনি, গ্রহণ করেছি।'

'বাণিজ্যপোত ভেড়ার স্থানটি রাজকোষাগারের অধীন। আর আমার কাছে যথার্থ সংবাদ আছে, বিনিয়ুক্তককে বন্দী করে হারটি সনাতনের কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছ তুমি।'

'তুমি আমাকে হাসালে, শর্বদেব। বিনিয়ুক্তক বা সনাতন এই চণ্ডকের কাছে ছুঁচোর মতো সামান্য প্রাণী। তাদের কাছ থেকে কেড়ে নেব আমি! এই কৈবর্তরাজ্যে তুমি আমার গুরুত্ব না বুঝলেও ওরা বোঝে। তাই আগ্রহ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেখানোমাত্র ওরা হারটি আমার হাতে তুলে দিল।' ব্যঙ্গের হাসিটি মুখে ঝুলিয়ে রেখে কথাগুলো বলে গেল চণ্ডক।

এবার রাগে ফেটে পড়ল শর্বদেব। চিৎকার করে বলল, 'তুমি মিথ্যেবাদী। তুমি পাষণ্ড। লুণ্ঠিত হারটি নিয়ে গিয়ে সামান্য বারাঙ্গনার গলায় ঝোলালে তুমি!'

শর্বদেবের চিৎকারে দেহরক্ষীরা ছুটে এল। চণ্ডককে ঘিরে ধরল তারা। এর মধ্যে শর্বদেব আর চণ্ডকের বাগ্‌বিতণ্ডার কথা মহারাজ পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। মহারাজের প্রধান দেহরক্ষী দ্রুত পায়ে এগিয়ে এল। চণ্ডককে উদ্দেশ করে বলল, 'মহারাজ আপনাকে ভেতরে আহ্বান করেছেন।'

চণ্ডক যেতে যেতে শর্বদেবকে লক্ষ করে বলল, 'আমি পাষণ্ড নই, মহারাজ আমাকে পুত্রের মর্যাদা দিয়েছেন। তোমার সেটা না জানার কথা নয়। আর মোহনাকে তুমি সামান্য বারাঙ্গনা বলেছ, শুনে রাখো—মোহনা আমার প্রাণ।'

বিস্ফারিত চক্ষে ক্রোধান্বিত শরীর নিয়ে অলিন্দে দাঁড়িয়ে থাকল শর্ব।

'তুমি এমন কাজ কেন করলে, চণ্ডক?' ভীম শান্ত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন।

চণ্ডক মহারাজ ভীমের প্রশ্নের কোনো জবাব দিল না, মাথা নত করে দাঁড়িয়ে থাকল।

চণ্ডককে নিরুত্তর দেখে ভীম আবার জিজ্ঞেস করলেন, 'কেন তুমি বল প্রয়োগ করে মহামূল্যবান হারটি কেড়ে নিলে?'

মহারাজ ভীমের কাছে চণ্ডকের অশেষ ঋণ। তাই শর্বের কাছে যে মিথ্যাটা সে খলবল করে বলেছে, মহারাজকে তা বলতে তার বাধছে। আর কেন নিয়েছে, সে কথাটি মহারাজের সামনে বলবেই বা কী করে? ভীম যে তার পিতৃতুল্য। পিতৃতুল্য বললে ভুল হবে, ভীম তার পিতাই তো। লালনকর্তা তিনি। কী বলবে সে? না হয় সে বলবে, কেড়ে নিয়েছে। কিন্তু কার জন্য কেড়ে নিয়েছে? বারবনিতা মোহনার জন্য?

মহারাজ ভীমের সামনে কী করে চণ্ডক স্বীকার করবে বারাঙ্গনাপল্লিতে তার যাতায়াত আছে! কী করে বলবে, কালাকোলা মোহনা তার দেহমন হরণ করেছে! তার রাত-দিনের সব অস্তিত্ব এখন মোহনার কাছে জমা আছে! সত্যের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তাই চণ্ডক নিরুত্তর।

কিন্তু চণ্ডকের নিরুত্তরতা ভীমকে চঞ্চল করে তুলল। কঠিন গলায় আবার জিজ্ঞেস করলেন, 'আমার প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছ না কেন তুমি, চণ্ডক? তাহলে কি আমি ধরে নেব, তুমি লুণ্ঠনকারী? পুত্রস্নেহে যাকে বড় করেছি, সে লুণ্ঠনকারী!'

ভীমের শেষের কথাটি চণ্ডককে বিচলিত করে তুলল। না, আর নয়। মিথ্যা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দিয়ে সত্যকে আর ঢাকা উচিত নয়। ধীরে ধীরে মাথা তুলল চণ্ডক। অত্যন্ত শান্ত কণ্ঠে বলল, 'আমার ভুল হয়ে গেছে, মহারাজ। হারটি আমার নেওয়া উচিত হয়নি।'

'এই বোধটি যদি তোমার আগে জাগত, তাহলে এত বড় অন্যায় তুমি করতে না। হারটি শর্বের স্ত্রীর জন্য আনা হয়েছিল।'

এবার কণ্ঠে দৃঢ়তা ঢেলে চণ্ডক বলল, 'শর্বের আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য নবরত্ন হারটি আনা হয়েছে। আমারও তো আকাঙ্ক্ষা থাকতে পারে, মহারাজ। আমি যদি আপনার সন্তানতুল্য হই, তাহলে আমারও বাসনা পূরণের দায়িত্ব আপনার ওপর বর্তায়। আমার বাসনা পূরণ করতে গিয়ে যদি কোনো অন্যায় করে থাকি, তাহলে আমাকে ক্ষমা করুন, মহারাজ।'

চণ্ডকের কথা ভীমের ভেতরটায় প্রচণ্ড একটা মোচড় দিল। সত্যিই তো, শর্বের যেমন অধিকার, চণ্ডকেরও তেমনি অধিকার। এই সত্য অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই। বিশাখা নদীর পাড় থেকে চণ্ডককে কুড়িয়ে আনার পর পুত্রস্নেহেই তো তাকে মানুষ করেছেন ভীম! আজ যদি শর্ব অথবা কপর্দী বা শম্ভু এ কাজটি করত, তাহলে তাকে ক্ষমা করে দিতেন না ভীম? নিশ্চয়ই ক্ষমা করে দিতেন।

ভেজা কণ্ঠে ভীম বললেন, 'ঠিক আছে, তুমি যাও, চণ্ডক। মনে রেখো, তোমার জন্য আমার অপত্যস্নেহ। ভবিষ্যতে এই স্নেহের অপমান কোরো না তুমি।'

চণ্ডক মাথা নিচু করে কক্ষ থেকে বেরিয়ে গেল। অলিন্দে শর্বের সঙ্গে আবার দেখা হয়ে গেল তার। পাশ দিয়ে যেতে যেতে জোরে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল সে। শর্বের মনে হলো, চণ্ডকের এই দীর্ঘশ্বাস কৃত্রিম এবং উপহাসমূলক।

নিজেকে আর ধরে রাখতে পারল না শর্ব। উচ্চকণ্ঠে বলল, 'কথায় আছে, চোরের মায়ের বড় গলা। চোরের আবার উপহাস! মাথা উঁচু করে হাঁটা!'

চণ্ডক ঘুরে দাঁড়াল। কিছুক্ষণ আগে ভীমের সামনে যে নিরীহ ভাব করে দাঁড়িয়েছিল চণ্ডক, মুহূর্তেই তা উবে গেল তার চেহারা থেকে। একধরনের হিংস্রতা ভেসে উঠল তার মুখজুড়ে। চিবিয়ে চিবিয়ে সে বলল, 'চোর নই আমি, বলো ডাকাত। আরও বলতে পারো লুণ্ঠনকারী। হ্যাঁ, লুণ্ঠন করেছি আমি। তরবারির আঘাতে চূর্ণ করেছি সিন্দুক। অনেক কিছু নিয়ে যেতে পারতাম আমি। তোমাদের ভাগ্য ভালো, শুধু হারটি তুলে নিয়েছি সিন্দুক থেকে। কী করতে পেরেছে তোমাদের রাজশক্তি? এই তরবারির সামনে মাথা উঁচু করে দাঁড়ায়, কার এমন দুঃসাহস!' তরবারির বাঁটে হাত ঘষতে ঘষতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একেবারে নিচুস্বরে, শুধু শর্ব শুনতে পায় এমনভাবে চণ্ডক বলল, 'কী করতে পেরেছেন মহারাজ, কী করেছেন তিনি আমাকে?' আবার কৃত্রিম দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে বলল, 'নিজের চোখেই তো দেখলে! মহারাজ ডাকলেন, আমি এলাম। আবার অক্ষত শরীরে প্রফুল্ল মনে ফিরে যাচ্ছি, দেখতেই তো পাচ্ছ।'

'বাবা যা করেননি, আমি তা করছি।' বলে রোষ-কষায়িত চক্ষে তরবারি কোষমুক্ত করল শর্ব।

ওপর থেকে চণ্ডক-বরাবর তরবারি নামিয়ে আনার আগ মুহূর্তে দ্রুত অগ্রসরমান প্রধান দেহরক্ষী চিৎকার করে উঠল, 'করেন কী, করেন কী যুবরাজ! শান্ত হোন, সংযত হোন।'

মহারাজ ভীম কিছুটা আঁচ করতে পেরেছিলেন। তাই চণ্ডকের পিছু পিছু প্রধান দেহরক্ষীকে পাঠিয়েছিলেন। প্রধান দেহরক্ষী যথাসময়ে উপস্থিত না হলে বড় একটা দুর্ঘটনা ঘটে যেত আজ। প্রধান দেহরক্ষীর কথায় শর্ব শান্ত হলো। তরবারি কোষবদ্ধ করে চণ্ডককে বলল, 'আর কোনো দিন যাতে তোমাকে এই রাজপ্রাসাদে না দেখি।'

চণ্ডক ব্যঙ্গের হাসি হেসে বলল, 'আমি যে এখানে অন্তত একবারের জন্য হলেও আসব, এটা জেনে রাখো, শর্ব। আর তুমি শর্ব সাবধানে থেকো, দীর্ঘদিন তোমার এই অপমানের কথা আমার মনে থাকবে।' বলে লম্বা লম্বা পা ফেলে দ্রুত ফটকের দিকে এগিয়ে গেল চণ্ডক।

'এত বড় অন্যায়ের পর আপনি তাকে ক্ষমা করে দিলেন, বাবা।' গভীর বেদনাজড়ানো কণ্ঠ শর্বের।

চণ্ডক চলে গেলে শ্লথ পায়ে বাবার কক্ষে এল শর্ব। মা নেই প্রাসাদে। সহচরীসহ রাজমন্দিরে গেছেন মহিষী দেবলা। প্রধান দেহরক্ষীও নির্ধারিত দূরত্বে ফিরে গেছে। পিতা আর পুত্র মুখোমুখি এখন।

'ক্ষমা আমি চণ্ডককে করিনি। সে ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ করেছে,' মহারাজ শান্ত কণ্ঠে বললেন।

শর্ব বলল, 'তাহলে ওই দুষ্টমতি কোনোরূপ শাস্তি না পেয়ে এই কক্ষ থেকে বেরিয়ে যেতে পারল কী করে?'

'আমি তাকে বেরিয়ে যেতে দিয়েছি।'

'কেন?'

তৎক্ষণাৎ শর্বের এই 'কেন'র জবাব দিলেন না মহারাজ। দীর্ঘক্ষণ উদাস চোখে গবাক্ষ পথে বাইরে তাকিয়ে থাকলেন ভীম। তারপর ধীরে ধীরে বলতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শুরু করলেন, 'আমাদের প্রধান সেনাপতি কঙ্কণদেব। তার অধীনে যে কজন সমরনায়ক আছে, তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম হলো এই চণ্ডক। যুদ্ধক্ষেত্রে আমার একদিকে তুমি থাকো, অন্যদিকে থাকে এই চণ্ডক। ঘোড়ায় চড়ে না সে, মহিষ তার বাহন। দীর্ঘ খরতর খড়্গ নিয়ে যখন সে শত্রুনিধনে মগ্ন হয়, তখন বড় অহংকার লাগে আমার, বড় ভরসা পাই তখন আমি। সমরদক্ষতা দিয়ে সে বারবার প্রমাণ করেছে—সে অপ্রতিরোধ্য, সে ভয়ংকর। তুমিও কম বড় যোদ্ধা নও। কিন্তু আজ আমার স্বীকার করতে দ্বিধা নেই, যুদ্ধদক্ষতায় কঙ্কণদেবের পরে চণ্ডকের স্থান।'

'তাই বলে এত বড় অপরাধের পরও সে পার পেয়ে যাবে?' ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলল শর্ব।

মহারাজ শর্বের এ প্রশ্নের কোনো জবাব দিলেন না। চিন্তিত কণ্ঠে বললেন, 'দ্বিতীয় রামপাল প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়েছে। তুমি তো জানো, জেঠামশাই, বরেন্দ্রির সূর্য দিব্যোক বৌদ্ধরাজা দ্বিতীয় মহীপালের কাছ থেকে এই বরেন্দ্রি কেড়ে নিয়েছিলেন। বঙ্গদেশের এই অঞ্চলে কৈবর্তরাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এত দিন রাজা-মহারাজাদের হাতে শাসনক্ষমতা ছিল, সেই ক্ষমতা কেড়ে নিয়েছেন জেঠামশাই। রাজতন্ত্র উপড়ে ফেলে সাধারণ মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছেন। কিন্তু পালরা সেটা মেনে নেয়নি কখনো। মহারাজ দিব্যোকের সময়ে, পিতা রুদকের শাসনামলে বারবার কৈবর্তভূমি আক্রমণ করেছে এই পালরা। কিন্তু বারবার কৈবর্তদের হাতে পরাজিত হতে হয়েছে পালদের। বাবার মৃত্যুর পর কৈবর্তরাজ্যের হাল ধরতে হলো আমাকে। তুমি তো জানো, আমার শাসনকালেও সীমান্তে ছোট-বড় নানা আক্রমণ চালিয়েছে রামপাল। কিন্তু দাঁড়াতে পারেনি সে আমাদের সামনে।'

AMARBOI.COM

মহারাজ ভীম একটু থামলেন। সামান্য ক্লান্তির রেশ তাঁর কণ্ঠে। গলা খাঁকারি দিয়ে কণ্ঠ থেকে ক্লান্তি ঝেড়ে ফেললেন তিনি। তারপর সতেজ কণ্ঠে বললেন, 'গুপ্তচর সংবাদ এনেছে, চৌদ্দজন সামন্তকে নানা লোভ দেখিয়ে জড়ো করেছে রামপাল। রামপালের পুত্ররা তার হাতের শক্তিকে বাড়িয়ে তুলেছে অনেক গুণ। শুনেছি, সীমান্তে বড় ধরনের সৈন্যসমাবেশ করতে মনস্থ করেছে রামপাল। যদি যুদ্ধ বাধে, তবে চণ্ডকের মতো সেনাপতিরাই হবে আমাদের যুদ্ধজয়ের প্রধান সহায়ক। এ সময় রাজপ্রাসাদে কোনো অশান্তি হলে তার সুযোগ নেবে বৌদ্ধরাজা। তাই, সবকিছু বুঝেও আমাকে চুপ থাকতে হচ্ছে আজ। চণ্ডককে তুমি যেমন চিনেছ, আমিও চিনে রাখলাম তাকে। আমাদের দুঃসময়টা পেরিয়ে যাক, শর্বদেব। তুমি ধৈর্য ধরো। বিষয়টি আমার মনে থাকবে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অবাক চোখে পিতার দিকে তাকিয়ে থাকল শর্বদেব। বাবার বিচক্ষণতায় সে মুগ্ধ। কত বিচক্ষণ তার পিতা! আমি হলে তো কঠিন শাস্তির বিধান দিতাম চণ্ডকের বিরুদ্ধে। কিন্তু তাতে রাজ্যের ক্ষতি হতো ভীষণ। বাবা দূরদর্শী বলে বৃহত্তর স্বার্থের জন্য ক্ষুদ্র অপরাধকে এড়িয়ে গেছেন। মনটা নরম হয়ে এল শর্বের। শ্রদ্ধার চোখে বাবার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল শর্ব। তারপর কক্ষ থেকে নিষ্ক্রান্ত হতে উদ্যত হলো।

ওই সময় অত্যন্ত কোমল কণ্ঠে মহারাজ ভীম বললেন, 'আমি তোমার ব্যথাটা বুঝছি, বাবা। মানুষের কাছে মা-বাবার পর স্ত্রীর স্থান। সেই স্ত্রীর আকাঙ্ক্ষা তুমি পূরণ করতে পারোনি। এখন তোমার মনে যে কী কষ্ট, তা আমি বুঝি। তুমি একটু অপেক্ষা করো, বাবা। পরের বাণিজ্যপোতে তোমার নবরত্নখচিত হারটি আমি আনিয়ে দিচ্ছি। এটি আরও মূল্যবান, আরও মনোলোভা হবে।'

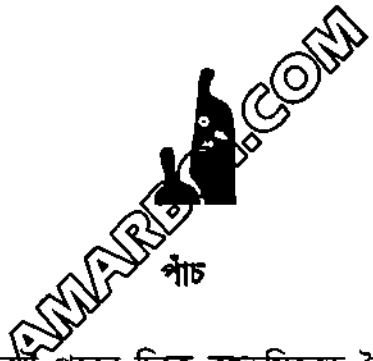
AMARBOI.COM

পাঁচ

অষ্টম শতক শুরুর একটু পরের দিকে বঙ্গভূমিজুড়ে নৈরাজ্যের সূচনা হয়। গৌড়, বঙ্গ আর সমতটে কোনো একক রাজার আধিপত্য নেই। রাষ্ট্রব্যবস্থা ছিন্নবিচ্ছিন্ন; জনজীবন বিপর্যস্ত, বিপন্ন। ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, ব্যবসায়ী নির্বিশেষে সবাই এ অঞ্চলের প্রভুত্ব দাবি করছে। বাহুবলই সর্বক্ষমতার উৎস হয়ে দাঁড়িয়েছে এ সময়। দেশময় বিশৃঙ্খল শক্তির আস্ফালন। যুক্তি অগ্রাহ্য, ন্যায় ভূলুণ্ঠিত, মিথ্যের সামনে সত্য নতজানু। চারদিকে মাৎস্যন্যায়ের প্রতিষ্ঠা। এ সময় বঙ্গদেশের কিছু শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ একজন অধিপতির প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে অনুভব করলেন। তাঁরা গোপালদেব নামের একজনকে রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে নির্বাচিত করলেন।

অষ্টম শতকের মাঝামাঝিতে গোপালদেব পাল বংশের প্রতিষ্ঠা করেন। প্রায় চার শ বছরজুড়ে পাল বংশ রাজত্ব করে। গোপালদেবের পর রাজা হন তাঁর পুত্র ধর্মপাল। ধর্মপালের রাজত্বকাল কাটল যুদ্ধবিগ্রহে। ধর্মপালের মৃত্যুর পর রাজা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হলেন দেবপাল। দেবপাল ধর্মপালের সাম্রাজ্যের সীমা বহুগুণ বিস্তৃত করেন। দেবপালের মৃত্যুর পর পালসাম্রাজ্যে রাহুর গ্রাস। তার পরও বিগ্রহপাল, নারায়ণপাল, রাজ্যপাল, দ্বিতীয় গোপাল, মহীপাল, নয়পালের অধীনে পালসাম্রাজ্য শাসিত হয়ে তৃতীয় বিগ্রহপালের হাতে রাজ্যশাসনের অধিকার বর্তাল। তৃতীয় বিগ্রহপালের তিন পুত্র—দ্বিতীয় মহীপাল, দ্বিতীয় শূরপাল আর রামপাল। এ সময়ের পাল রাজ্য ক্ষীণকায়। যা আছে তা-ও ভিনদেশি আক্রমণে ভেঙে পড়ার উপক্রম। পালদের শাসনমুষ্টি শিথিল হয়ে এসেছে।

তৃতীয় বিগ্রহপালের মৃত্যুর পর ক্ষীয়মাণ পাল রাজ্যের অধিপতি হলেন দ্বিতীয় মহীপাল।

মহীপাল সন্দেহপ্রবণ। কূটবুদ্ধি কম তাঁর। শক্তির চেয়ে আস্ফালন বেশি। রাজাদের অধিকাংশ বুদ্ধি জোগায় পারিষদরা, তেমন পারিষদ যদি হয়। আবার স্বার্থবাদী, লোভী পারিষদও আছে। তারা কুমন্ত্রণা দেয়। মানুষ সুপরামর্শের চেয়ে কুমন্ত্রণাই শোনে বেশি। সব নৃপতি আবার একরকম নন। যাঁরা পারিষদদের পরামর্শের সঙ্গে নিজের বিবেচনাকে মেশাতে পারেন, তাঁরা কালে কালে শ্রেষ্ঠ নৃপতি হিসেবে মর্যাদা পান। আর যাঁদের বিবেক-বুদ্ধি কম, তাঁরা সহজেই কুমন্ত্রণায় প্রভাবিত হন। ভুল সিদ্ধান্ত নেন তখন তাঁরা। ভুল সিদ্ধান্তে বিপর্যয় নামে—নিজ জীবনে এবং রাজ্যশাসনে। মহীপালেরও হয়েছিল তা-ই।

অনেক সামন্ত নিয়ে পাল রাজার রাজ্য। সামন্তরা কর দেয়, পাল বংশের আধিপত্য স্বীকার করে। নামে আধিপত্য স্বীকার করা, মূলত সব সামন্ত স্বাধীন। নিজেদের অধিভুক্ত এলাকায় নিজেদের প্রচলিত আইনই প্রয়োগ করে সামন্তরা, পাল রাজার আইনের প্রয়োগ সেখানে শিথিল। পাল রাজারা এটা জানেন। জেনেও প্রশ্রয় দেন। কারণ, প্রয়োজনে ডাক দিলে সামন্তরা এসে জড়ো হয় রামাবতিতে। যুদ্ধবিগ্রহে সাহায্য দেয়। অর্থ এবং সৈন্য পাঠিয়ে বহিঃশত্রু বিতাড়নে সহযোগিতা করে। এ জন্য সামন্তদের ছোটখাটো ঔদ্ধত্যকে এড়িয়ে চলেন পাল রাজারা।

মহীপাল নৃপতি হওয়ার পর এভাবেই চলছিল। সাম্রাজ্যজুড়ে সামন্তরা ছড়িয়ে আছে। রাজার বা নিজেদের প্রয়োজনে রাজধানী রামাবতিতে আসা-যাওয়া সামন্তদের। রাজধানী রমরমা। বর্তমানে প্রায় সব সামন্ত বশীভূত। তার পরও মহীপালের মনে শান্তি নেই। কেবলই মনে হয়, তাঁর রাজপ্রাসাদ কণ্টকাকীর্ণ। এই কাঁটা আর কেউ নন, তাঁর আপন দুই ভ্রাতা—শূরপাল আর রামপাল। সন্দেহ মহীপালকে দিশেহারা করে তোলে। ভাইয়েরা উপযুক্ত হয়ে উঠেছে। বিদ্যাবুদ্ধিতে শূরপালের চেয়ে রামপাল এগিয়ে। তাই মহীপালের সন্দেহ কনিষ্ঠ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভ্রাতা রামপালকে ঘিরেই বেশি আবর্তিত। রামপালের চালচলনের সুলুকসন্ধান করার জন্য মহীপাল গুপ্তচর লাগিয়েছেন। গুপ্তচরেরা রামপালের পেছনে লেগে থাকে। কিন্তু রামপালের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ উপস্থাপন করতে পারে না গুপ্তচরেরা। মহীপাল খেপে যান। গর্জন করে বলেন, 'দুর্বৃত্ত তোমরা, রামপালের কাছ থেকে উৎকোচ খেয়েছ। তাই তার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনছ না। আমি জানি, রামপাল আর শূরপাল—উভয়ে আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। আমাকে উৎখাত করে রামপাল রাজা হতে চায়, শূরপাল প্রধান সেনাপতি হতে চায়।'

গুপ্তচরেরা যতই না না করে, মিথ্যা সন্দেহ তত বেশি করে শিকড় বিস্তার করে তাঁর মনে। কিন্তু মহীপাল তাঁর সন্দেহের ব্যাপারটি শূরপাল আর রামপালকে বুঝতে দেন না। দিব্যোক তখন পাল রাষ্ট্রের একজন গণনীয় কর্মচারী। শুধু তা-ই নয়, দিব্যোক বরেন্দ্রির সামন্তও। মহীপাল বড় বিশ্বাস করেন দিব্যোককে। দিব্যোককে নানা গুরুত্বপূর্ণ রাজকার্যের দায়িত্ব দিয়ে সুফল পেয়েছেন মহীপাল।

দিব্যোক ধীরে ধীরে রাজকর্মচারী থেকে পারিষদের মর্যাদায় আসীন হলেন। মন্ত্রীবর্গের পাশাপাশি দিব্যোকও বসেন রাজসভায়। আর বসেন শূরপাল ও রামপাল। শূরপাল মিতভাষী। অধিক খেয়ালে চলেন। রাজসভায় বসলেও রাজকার্যে মাথা ঘামান না। রামপাল তাঁর বিপরীত। ভাইদের মধ্যে বিচক্ষণ তিনি। ন্যায়ের চেয়ে কূটচাল যে রাজার জন্য বেশি দরকার, তা রামপাল জানেন এবং মানেন। মহীপালের জন্য তাঁর অপার ভালোবাসা আর শ্রদ্ধা। কিন্তু আবেগপ্রবণ নন বলে তা সর্বদা আচরণে প্রকাশ করেন না রামপাল। ভুল সিদ্ধান্তের কারণে দাদা কোনো বিপদে পড়ুন, এটা কোনোভাবেই চান না রামপাল। তাই মহীপালের ভুল সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করেন মাঝেমধ্যে। আসলে মহীপাল ক্ষীণবুদ্ধি। রামপালের সদিচ্ছাকে মেনে নেন না তিনি। ভাবেন, এ রামপালের একধরনের কূটচাল।

জয়পালের আমল থেকে ভিনদেশি আক্রমণে পালরাজ্য লণ্ডভণ্ড। এ সময় পরিতোষ এবং তার পুত্র শূদ্রক, পালরাজ্যের দুই সামন্ত, গয়া অঞ্চলে বিদ্রোহী হয়ে উঠল। বর্মণ রাজবংশ পূর্ববঙ্গে স্বাধীন রাজ্য গড়ে তুলল। এসব এলোমেলো অবস্থার মধ্যেই মহীপালের রাজ্যশাসন। সীমান্ত অঞ্চলের বেশ কজন সামন্ত হঠাৎ পাল রাজার বশ্যতা অস্বীকার করল। মহীপাল এদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করার সিদ্ধান্ত নিলেন। প্রধান সমরনায়ক এবং মন্ত্রিপরিষদের কয়েকজন তাঁকে যুদ্ধাভিযানে প্ররোচিত করলেন। বাধা দিলেন রামপাল। বললেন, 'দাদা, এ সময় আপনার যুদ্ধাভিযান ফলপ্রসূ হবে না। এ মুহূর্তে আমাদের তেমন অর্থবল নেই, সৈন্যবল নেই। তড়িঘড়ি করে যুদ্ধাভিযান করলে পরাজয়ের সম্ভাবনা বেশি।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দিব্যোক বললেন, 'যুবরাজ রামপাল যথার্থ বলেছেন, মহারাজ। যারা যুদ্ধবিগ্রহে এবং আকালে আপনাকে অর্থ ও সৈন্য দিয়ে সাহায্য করত, তাদের অনেকেই আজ বিদ্রোহী। বিদ্রোহীরা দুর্দান্ত হয়ে উঠেছে। এ সময় অপর্যাপ্ত সৈন্যবল নিয়ে বিদ্রোহ দমনে মনোনিবেশ করা আপনার উচিত হবে না।'

মহীপালের সন্দেহ সুদৃঢ় হয়। তাহলে এই কথা—তলে তলে ষড়যন্ত্র, রামপাল আর দিব্যোক একত্র হয়ে একই সুরে কুমন্ত্রণা! কোথায় সৎপরামর্শ দিবি, প্রধান সমরনায়ককে সমর্থন করে আমাকে যুদ্ধাভিযানে সহায়তা করবি, তা না করে কুমন্ত্রণা! আমাকে নিষ্ক্রিয় দেখে বিদ্রোহী সামন্তরা রামাবতি আক্রমণ করুক, তাতেই তো তোদের সুখ; আমি রাজ্যচ্যুত হলে তোদের অভিসন্ধি তো সার্থক হবে!

মহীপাল গর্জে উঠলেন, 'কী বলছ তোমরা দুজনে? বিদ্রোহ দমন করব না আমি? বিশ্বাসঘাতকদের উচিত শিক্ষা দেব না আমি?'

'অবশ্যই দেবেন, তবে শিক্ষা দেওয়ার সময় এখন নয়। এখন আপনি বিপর্যস্ত,' রামপাল বললেন।

মহীপাল অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকলেন রামপালের দিকে। তারপর চিবিয়ে চিবিয়ে বললেন, 'বিপর্যস্ত! আমি!'

'হ্যাঁ মহারাজ, আপনি এখন শুধু বিপর্যস্তই নন, বিপন্নও। যাঁরা আপনাকে যুদ্ধাভিযানের প্ররোচনা দিচ্ছেন, তাঁরা আপনাকে কুমন্ত্রণা দিচ্ছেন। তাঁরা আপনার মঙ্গল চান না,' দিব্যোক বললেন।

রামপাল এবার ধীরে ধীরে বললেন, 'দাদা, আপনি নিজের দিকে ভালো করে তাকিয়ে দেখুন, দেখবেন—রাজকোষে পর্যাপ্ত অর্থ নেই। আমাদের সৈন্যরা তো বেতনধারী, যুদ্ধের সময় রাজ্য থেকে যে সৈন্য সংগ্রহ করা হয়, তাদেরও বেতন দিতে হয়। আপনার রাজকোষে কি পর্যাপ্ত অর্থ আছে? আপনার পূর্ববর্তী পাল রাজারা সর্বদা নানা যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত থেকেছেন, তাতে অনেক সৈন্য আহত-নিহত হয়েছে। পাল রাজার নিয়মিত সৈন্যবাহিনী ক্ষয় হতে হতে এখন একেবারে ক্ষীণকায় হয়ে গেছে। অনেক সামন্তের সঙ্গে আপনার সদ্ভাব নেই। তাই আমার পরামর্শ এই—আপনি এখন যুদ্ধে নামবেন না।'

মিতভাষী শূরপাল হঠাৎ কথা বলে উঠলেন, 'হ্যাঁ দাদা, ছোট ভাই রামপাল যথার্থ বলেছে।'

দিব্যোক বললেন, 'আমাদের কথা শুনুন, মহারাজ, প্রধান সমরনায়ক আপনাকে বিপথে পরিচালিত করছে। ভুল করবেন না।'

মহীপাল কোনো কথা বললেন না। মাথা নিচু করে কী যেন ভাবলেন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দীর্ঘক্ষণ। তারপর মাথা তুললেন। দিব্যোক মহীপালের অভিব্যক্তি দেখে বুঝলেন, মহীপাল তাঁদের পরামর্শ মেনে নেননি। কী রকম যেন একটা অভিসন্ধি তাঁর চোখেমুখে কাজ করছে।

মহীপাল বললেন, 'তোমরা যাও এখন, আমাকে একটু ভাবতে দাও।'

আগে থেকেই মহীপাল ভাইদের সন্দেহের চোখে দেখতেন। তাঁর মাথায় এই চিন্তা দানা বেঁধেছিল যে, ভাইয়েরা তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে। অচিরেই তাঁরা তাঁকে রাজ্যচ্যুত করবে অথবা হত্যা করবে। আজকের কুপরামর্শে তাঁর চিন্তাটা বদ্ধমূল হলো। পরদিন সকালে মহীপালের ভাবনার ফল পেল শূরপাল আর রামপাল। দেশের মানুষ দেখল, রাজার আদেশে শূরপাল ও রামপাল কারাগারে নিক্ষিপ্ত হয়েছেন। সৈন্য লেলিয়ে দিলেন দিব্যোকের পেছনে।

দিব্যোক রাতেই আঁচ করতে পেরেছিলেন মহীপালের অভিসন্ধি। তাই প্রভাত হওয়ার আগেই তিনি রামাবতি থেকে পালিয়ে গেলেন।

বরেন্দ্রিতে ফিরে এলেন দিব্যোক। তাঁর চারপাশে জড়ো হলো কামার, কুমোর, মুচি, ব্যাধ, তাঁতি, ডোম। আর জড়ো হলো কৈবর্ত—হালিক ও জালিক কৈবর্ত। সবাই চিৎকার করে উঠল, 'মোরাদের রাজাকে অপমান! তাঁকে সন্দেহ! ভালোমানুষির কোনো দাম নেই? বুঝবে বেটা একদিন। নিজের ভাইকে বন্দী করার আর মোরাদের রাজাকে অপমানের মজা টের পাবে একদিন।'

মহীপালের কাছে মিথ্যা খবর গেল, দিব্যোক তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছেন। শুধু তা-ই নয়, যুদ্ধের জন্যও প্রস্তুত হচ্ছেন দিব্যোক। এদিকে দিব্যোকের মনে আকুলিবিকুলি। মহীপাল তাঁর বিরুদ্ধে কোনো মন্দ পদক্ষেপ নেবেন না তো? মহীপালের শরীরের রন্ধ্রে রন্ধ্রে অবিশ্বাসের পোকা কিলবিল করে। সৎকে অসৎ বোঝেন আর অসৎকে সৎ মানেন তিনি। কখন কী করে বসেন, কে জানে! গুপ্তচরেরা সংবাদ আনে, ভীষণ খেপে গেছেন মহীপাল। মহীপাল দিব্যোকের বিরুদ্ধে যুদ্ধপ্রস্তুতি নিচ্ছেন।

দুর্বল সৈন্যদল এবং অপর্যাপ্ত যুদ্ধোপকরণ নিয়ে মহীপাল দিব্যোকের বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিযান করলেন। সামন্তদের বিদ্রোহের কথা তিনি বেমালুম ভুলে গেলেন। নিজেই তিনি দিব্যোকের বিরুদ্ধে সমরাভিযানে নেতৃত্ব দিলেন। বরেন্দ্রি সীমান্তে সৈন্যসমাবেশ ঘটালেন মহীপাল।

পুলিন্দ, কৈবর্ত, হাঁড়ি, ডোম, নিষাদ, চণ্ডাল, বণিক, কামার-কুমোর, চাষি-মজুর তখন এককাট্টা। দিব্যোকের চারদিকে তারা সমবেত হলো। বলল, 'প্রাণ দেব মোরা, কিন্তুক মোরাদের রাজার অপমান হতে দেব না।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দিব্যোক বললেন, 'এ যুদ্ধ সামান্য যুদ্ধ নয়, স্বাধীনতার যুদ্ধ। রাজার মানের চাইতে দেশের মান বড়। আমরা প্রাণ দিয়ে দেশের মান রাখব।'

দিব্যোকের নেতৃত্বে বরেন্দ্রির সাধারণ মানুষ যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ল। মানুষ মরল হাজারে হাজারে। রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ শেষে মহীপাল বাহিনী পর্যুদস্ত হলো। দিব্যোকের তরবারির আঘাতে নিহত হলেন মহীপাল।

সেই থেকে দিব্যোক স্বাধীন রাজা, বরেন্দ্রভূমির। দিব্যোক প্রজাদের ওপর থেকে কর কমালেন, অসংখ্য পুকুর-দিঘি খনন করালেন, প্রজার প্রয়োজনে পথঘাট নির্মাণ করালেন। আর তৈরি করলেন নতুন নগর। এই নগরের নাম দিলেন ডমরনগর। ডমরনগর রাজধানী, কৈবর্তরাজ্যের রাজধানী। রাজধানীতে তৈরি করলেন রাজপ্রাসাদ। এই প্রাসাদ মহীপালের রাজপ্রাসাদের চেয়েও উজ্জ্বল, ঐশ্বর্যমণ্ডিত।

দিব্যোক বললেন, 'মোরা কৈবর্ত। হাল, জাল আর নৌকা মোরাদের বাঁচার সম্বল। রাজবাড়ির সামনে বিশাল করে হাল-জাল-নৌকার স্তম্ভ বানাও। ওটাই মোরাদের কীর্তিস্তম্ভ, মোর জয়ের চিহ্ন।'

এ যেন রাজার আদেশ নয়, বরেন্দ্রির মানুষের হৃদয়বাসনা। রাজার বাসনা মানে প্রজার বাসনা। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পাথর আনা হলো ডমরনগরে। শিল্পীরা খোদাইয়ে লেগে গেল। পাথরখণ্ড থেকে বেরিয়ে এল হাল-জাল-নৌকা। নৌকার পাছায় শক্ত মুঠিতে হাল ধরা একজন মাঝি। বরেন্দ্রির এখান-ওখান থেকে, কালিন্দীর এপার-ওপার থেকে, পাহাড়ি অঞ্চল থেকে, সমতলভূমি থেকে দলে দলে প্রজারা আসে। কীর্তিস্তম্ভের সামনে দাঁড়িয়ে অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে তারা। বলে, 'দেখেছ, কী সোন্দর স্তম্ভ! মাঝিরে মোরাদের রাজা দিব্যোকের মতো দেখাচ্ছে।'

ওদিকে কারাগার থেকে মুক্তি পেলেন শূরপাল আর রামপাল। রাজা হলেন শূরপাল। শূরপাল বেশি দিন রাজত্ব করতে পারলেন না। শূরপালের পর রামপাল রাজা হলেন। রামপালের অন্তরে ধিকিধিকি ক্রোধ। কৈবর্ত দিব্যোকের হাতে পাল বংশের অধিরাজ মহীপালের মৃত্যু! মৃত্যু নয়, হত্যা। কিছুতেই মেনে নেওয়া যায় না এ হত্যা। প্রতিশোধ চাই। প্রতিশোধ নিতে হবে। করুন না মহীপাল তাঁকে বন্দী! বন্দিত্বের চেয়ে হত্যা অনেক বেশি নিন্দনীয়। বন্দীশালা থেকে বেরিয়ে রামপাল প্রতিজ্ঞা করলেন—ভ্রাতৃহত্যার প্রতিশোধ নেবেন, তা সে যেকোনো কিছুর বিনিময়েই হোক না কেন? সৈন্য জড়ো করেছিলেন রামপাল, কিছু সামন্তের আনুকূল্যও পেয়েছিলেন। কিন্তু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দিব্যোকের সামনে দাঁড়াতে পারেননি রামপাল। বারবার পর্যুদস্ত হয়ে নিজের রাজধানীতে ফিরে গেছেন।

সাতাশ বছর রাজত্বের পর দিব্যোকের স্বাভাবিক মৃত্যু হলো। প্রজারা রাজা হিসেবে বেছে নিল রুদককে। রুদক দিব্যোকের ভাই। রুদক বেশি দিন বাঁচেননি। রুদকের মৃত্যুতে ভীম হলেন কৈবর্তরাজ—বরেন্দ্রির সূর্য। বরেন্দ্রিবাসীর দিব্যোককে উপাধি দিয়েছিল বরেন্দ্রির সূর্য বলে। দিব্যোকের পর ভীম হলেন বরেন্দ্রির সূর্য।

কৈবর্তদের জয়জয়কার চারদিকে। সবাই বলছে, 'জয়, বরেন্দ্রি সূর্যের জয়।'

রামপালের মনে সুখ নেই। দিব্যোকের কাছে পরাজয়, সামান্য রুদকের কাছেও পরাজয়। আর এখন কোথাকার কোন ভীম—তাঁর কাছেও বারবার পরাজিত হতে হতে রামপালের সব স্বস্তি তিরোহিত হয়ে গেছে। রামপালের এক কথা, ভীমের ধ্বংস চাই। কিন্তু চাইলেই তো আর ভীমকে ধ্বংস করা যায় না! জনমানুষের অন্তরে ভীমের জন্য বিপুল ভালোবাসা। দিব্যোক তাঁর শাসনামলে সমৃদ্ধির সূচনা করেছিলেন। রুদক হাতে বেশি সময় পাননি। তার পরও তিনি রাজ্যে সমৃদ্ধির প্রবাহ অব্যাহত রেখেছিলেন। মহারাজ ভীম সমৃদ্ধির রথ রাজধানী থেকে গ্রামে-পাহাড়ে, কালিন্দী তীরলগ্ন জনবসতিতে টেনে নিয়ে গেলেন। জায়গায় জায়গায় মন্দির নির্মাণ করলেন। শিবমন্দির। কৈবর্তরা শাক্ত নয়, শৈব। কৈবর্তরাজ্যের অধিকাংশ মন্দিরই তাই শিবমন্দির। সুযোগ পেলে গ্রামে-প্রান্তরে ঘোরেন ভীম। জিজ্ঞেস করেন, 'এই গাঁয়ের নাম কী?'

সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে গ্রামবাসী বলে, 'মহারাজ, এই গ্রামের নাম শিবপুর।'

'শিবপুর! কে দিয়েছে এ রকম নাম?'

গ্রামবাসী করজোড়ে বলে, 'আজ্ঞে মোরাদের রাজা দিয়েছে, বরেন্দ্রির সূর্য দিব্যোক দিয়েছে এই গ্রামের নাম শিবপুর।'

ভীমের হঠাৎ মনে পড়ল—তাই তো, মহারাজ দিব্যোকই তো এই স্থানের নাম শিবপুর দিয়েছিলেন। রামপালের সঙ্গে ঘোরতর যুদ্ধ তখন। বিপুল সৈন্যদল নিয়ে কৈবর্তরাজ্য আক্রমণ করেছে তখন রামপাল। দিব্যোক রামপালের সৈন্যবাহিনীকে খেদিয়ে দিলেন সীমান্ত পর্যন্ত। স্থানে স্থানে যুদ্ধ চলেছিল সেবার। ভীম তখন তরুণ। তরুণ ভীম দিব্যোকের সঙ্গে গোটা যুদ্ধক্ষেত্র দাপিয়ে বেড়িয়েছেন। কচুকাটা করেছেন পাল সৈন্যদের। সীমান্ত থেকে ফেরার পথে ক্লান্ত সৈন্যরা একদিন একরাতের বিশ্রাম চাইল দিব্যোকের কাছে। মহারাজ ছাউনি ফেলার আদেশ দিলেন। গ্রামবাসী দলে দলে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মহারাজকে দেখতে এল, বরেন্দ্রির সূর্য দিব্যোককে একনজর দেখলে গয়া-কাশি যাওয়ার পুণ্য হয়। কেউ গাছের ডাব নিয়ে, কেউ কাঁঠাল, লাউ, বরবটি, শসা, ঢ্যাঁড়স নিয়ে রাজদর্শনে এল। বেশির ভাগ এল খালি হাতে, কিন্তু ভরা মনে। শ্রদ্ধায় এবং কৃতজ্ঞতায় ভরা তাদের মন। কৈবর্তরা জানত, তারা হীন জাতি। কিন্তু বরেন্দ্রির সূর্য সমগ্র পৃথিবীকে জানিয়ে দিলেন, কথাটা সত্যি নয়। কৈবর্তরাও রাজা হতে জানে, রাজ্যশাসন করতে জানে। ক্লান্ত-শ্রান্ত সৈন্যদের খাওয়ার জন্য গ্রামবাসী কলস কলস জল এনেছিল। রাজা জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'কোন দিঘির জল?'

প্রজারা বলেছিল, 'দিঘি নাই ইখানে। ওই দূরে বিশাখা নদী, কালিন্দীরই শাখা। ওখান থেকে জল আনি মোরা। এই জল সেই জল।'

দিব্যোক ভীমের দিকে ঘুরে বললেন, 'ভীম, সরোবর কাটো। একদিন একরাতের মধ্যে কাটা শেষ হওয়া চাই। সরোবরের পাড়ে মন্দির চাই, শিবমন্দির।'

এক দিন এক রাতের পর আরও এক দিন থেকে যেতে হয়েছিল মহারাজ দিব্যোককে। সৈন্যদের সঙ্গে গ্রামবাসী মিলে যথাসময়ে সরোবর কাটা শেষ করেছিল। মন্দিরও তৈরি হয়েছিল। কিন্তু শুধু মন্দির তৈরি হলে তো হবে না, মন্দিরে পুজো চাই। আর প্রথম পুজো দেবেন কৈবর্তরাজ দিব্যোক।

বামুন পাঁজি দেখে বললেন, 'আগামীকাল শুভদিন।'

'কালকে শিবমন্দিরে শিবের পুজো হবে,' রাজা বললেন।

পরের দিন পুজো সম্পন্ন করেই দিব্যোক সসৈন্যে ডমরনগরের দিকে রওনা দিয়েছিলেন।

AMARBOI.COM

ছয়

বিশাখার জল খেয়ে বড় তৃপ্তি পেয়েছিলেন ভীম। বিশাখাকে দেখতে বড় মন চাইছিল তাঁর। কয়েকজন সৈন্য নিয়ে ভোরসকালেই শিবপুর থেকে বিশাখার উদ্দেশে যাত্রা করেছিলেন তিনি। পিছু নিয়েছিল উৎসুক গ্রামবাসী। হাঁটুজলে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নেমে আঁজলা ভরে জল খেয়ে নদীপাড়ে উঠে আসার পর চোখ পড়েছিল শিশুটির ওপর। ধূলি-ধূসরিত। ছেঁড়া এক টুকরা কাপড় জড়ানো কোমরে। ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল, ধুলোমলিন। উদোম শরীরের নানা স্থানে আঁচড়ের দাগ। কত আর বয়স হবে শিশুটির! দুই-আড়াই বছরের বেশি না। তারস্বরে কাঁদছিল শিশুটি। গোল গোল চোখ দুটো দিয়ে অঝোর ধারায় জল গড়াচ্ছিল। ভীম জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'শিশুটি কার? কাঁদছে কেন ও?'

দেহরক্ষীদের ঠেলে এক বৃদ্ধ এগিয়ে এসেছিল ভীমের সামনে। বলেছিল, 'পাগলির বেটা।'

'পাগলির বেটা!'

'হ্যাঁ, ওই শিশুটির মা পাগলি। আগের বছরের আগের বছরের আগের বছর বৌদ্ধসৈন্যরা এই পথে আক্রমণ করেছিল মোরাদের রাজ্যে। যুদ্ধে না পেরে এই পথেই পালিয়েছিল তারা। পালাতে পালাতে ধ্বংস করেছে ঘরবাড়ি, মন্দির। আর করেছে বলাৎকার। নকুলের মেয়ে কৌশিল্যাকে কজন মিলে বলাৎকার করেছিল তখন। পেটে এসেছিল ওই শিশুটি। কৌশিল্যা পাগল হয়ে গিয়েছিল সে সময়। গাছের ডাল ভেঙে শুধু নিজের পেটে আঘাত করত কৌশিল্যা। আর বলত, মর মর, তুই মর।'

ভীম জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'তারপর?'

অনেকক্ষণ কথা বলার সুযোগ পেয়ে বৃদ্ধটির সাহস বেড়ে গিয়েছিল। স্বাভাবিক কণ্ঠে বলেছিল, 'শিশুটি জন্মানোর পরও বেঁচে ছিল পাগলিটি। লম্বা লম্বা নখ দিয়ে শুধু শিশুটির গায়ে আঁচড়াত। কেন জানি পাঁচ দিন আগে ওই বিশাখাতে ঝাঁপ দিয়ে মরল কৌশিল্যা। সেই থেকে এই নদীপাড়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদছে শিশুটি। এখান থেকে যায় না কোথাও। এ ও দু-এক মুঠো ভাত, চিড়ামুড়ি দিয়ে যায়। ওইগুলো খায় আর কাঁদে।'

'কী নাম শিশুটির?'

'নাম তো জানি না মোরা। মানুষে ডাকে পাগলির বেটা।'

ভীমের কলিজায় একটা মোচড় লাগল। ভীম এগিয়ে গেলেন শিশুটির দিকে। ধুলোজড়ানো শিশুটিকে কোলে তুলে নিলেন। বললেন, 'আজ থেকে এর নাম হোক চণ্ডক। আমি ওকে নিয়ে গেলাম।'

আশপাশের মানুষ জয়ধ্বনি দিয়ে উঠল—জয়, ভীমের জয়।

দিব্যোক জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'এই শিশু দিয়ে তুমি কী করবে, ভীম?'

ভীম উত্তর দিয়েছিলেন, 'পালব, চণ্ডককে আমি পালব।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'চণ্ডক!' অবাক চোখে ভীমের দিকে তাকিয়েছিলেন দিব্যোক।

'ওর কোনো নাম ছিল না, জেঠামশাই। নদীর ধারে কাঁদছিল। বড় মায়া লাগল। নিয়ে এলাম। আমিই নাম দিয়েছি চণ্ডক,' ভীম বললেন।

মুচকি হেসে দিব্যোক বললেন, 'বিয়ে হয়নি তোমার এখনো। এই বয়সেই মায়া! তাও আবার ছোট শিশুর প্রতি!' একটু থেমে দিব্যোক আবার বললেন, 'চণ্ডক শব্দটির অর্থ জানো তুমি? চণ্ডক মানে ভয়ংকর।'

'হ্যাঁ জেঠা, শব্দটির অর্থ আমি জানি। রণে ভয়ংকর যে, সে-ই তো চণ্ডক। নিজের মধ্যে তীব্র শক্তি রাখে যে তাকে চণ্ডক বলে। আমি এই ছেলেটিকে শক্তিধর করে গড়ে তুলব। যুদ্ধে সে অপ্রতিদ্বন্দ্বী হবে। তার তীক্ষ্ণ উগ্র স্বভাব দিয়ে সে শত্রুদলে ত্রাস জাগাবে—এই আমার স্বপ্ন,' ভীম আবেগপ্রবণ কণ্ঠে বললেন।

দিব্যোক হাসতে হাসতে বললেন, 'চণ্ড থেকে যেমন চণ্ডক হয়, তেমনি চণ্ডালও হয়। চণ্ডাল শব্দের মানে জানো তো? নিষ্ঠুর প্রকৃতির লোককে চণ্ডাল বলে। তোমার এই ছেলেটি কালে কালে চণ্ডক না হয়ে আবার চণ্ডাল হয়ে যায়!'

ভীম বললেন, 'আমি তাকে চণ্ডাল হতে দেব না। এমনভাবে গড়ে তুলব একে, সে চণ্ডক হবে। পিতার স্নেহ উজাড় করে দেব আমি তাকে, পুত্রের মর্যাদা দেব।'

পুত্রের মর্যাদাই দিয়েছিলেন ভীম চণ্ডককে। রাজপ্রাসাদে ফিরে তার লালনপালনের সুব্যবস্থা করেছিলেন। দুজন দাসী চণ্ডকের পরিচর্যার জন্য নিযুক্ত করেছিলেন। মাথা তোলা হলে চতুষ্পাঠীতে পাঠিয়েছিলেন।

রুদকের শাসনামলে ভীমের বিয়ে হলো। রুদক বলেছিলেন, 'সব সময় যুদ্ধবিগ্রহ লেগে আছে রাজ্যে। কোন সময় আমার কী হয়, জানি না বাপু। তোমার বিয়ের ব্যবস্থা করি। না করো না।'

ভীম না করেননি। বিয়ের কথা ঠিকঠাক। বিয়ের কদিন আগে দেবলার পরিবার আপত্তি তুলল, চণ্ডক কে? তার পিতৃপরিচয় কী?

রুদক শান্তস্বরে সবকিছু বুঝিয়ে বলেছিলেন দেবলার বাবাকে। দেবলার বাবা-মা মেনে নিয়েছিল চণ্ডককে।

বাসররাতে ভীম দেবলাকে বলেছিলেন, 'দেখো দেবলা, চণ্ডক আমার ছেলে নয়, কুড়িয়ে পাওয়া সন্তান। তাকে দেখার পর থেকে সন্তানের মর্যাদা দিয়ে আসছি আমি চণ্ডককে। সে বুদ্ধিমান। কয়েক দিন দেখলে তোমারও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চণ্ডককে ভালো লাগবে। তোমার সন্তান হবে। ওই সন্তানগুলোর সাথে যাতে চণ্ডকও বেড়ে ওঠে, তা খেয়াল রাখবে তুমি।'

দেবলা মুখে কিছু বলেননি সে রাতে। কাজে প্রমাণ দিয়েছিলেন। বছর দুয়েকের মধ্যে শর্ব জন্মাল। দেবলার আচরণে রাজপ্রাসাদের কেউ অনুভবই করতে পারল না যে, চণ্ডক দেবলার পেটেধরা সন্তান নয়। তারপর কপর্দী হলো, শম্ভু হলো। সবাই জানল এবং বুঝল, ভীমরাজের চারজন পুত্র—চণ্ডক, শর্ব, কপর্দী আর শম্ভু।

ভীম চারজনকে শাস্ত্রজ্ঞান দিলেন। কপর্দী শাস্ত্রজ্ঞানান্বেষণে নিজেকে নিয়োজিত রাখল। শম্ভু শরীরচর্চায় মগ্ন হলো। চণ্ডক আর শর্ব রণবিদ্যায় দক্ষতা অর্জন করল। অস্ত্র এবং শস্ত্র চালনায় দুজনই খ্যাতিমান। কিন্তু তির আর বর্শা নিক্ষেপে শর্ব চণ্ডককে ছাড়িয়ে গেল, আর চণ্ডকের শস্ত্র ব্যবহারের নিপুণতার দৌড়ে শর্ব পিছিয়ে থাকল। চণ্ডক তরবারি ব্যবহার করে না, তার শস্ত্র হলো খড়্গ, বিশাল বাঁকানো খড়্গ।

এমনিতেই চার ভাইয়ের মধ্যে সম্প্রীতিভাব। কিন্তু তার পরও যেন শর্ব আর চণ্ডকের মধ্যে সামান্য রেষারেষি। চণ্ডক মনে করে, শর্ব অস্ত্রবিদ্যা জানলে কী হবে, রণকৌশলে চণ্ডক এগিয়ে। যুদ্ধক্ষেত্রে তার খড়্গের আঘাত থেকে রেহাই পায় না শত্রুরা। তার খড়্গ যেমন বিশাল, তেমনি দীর্ঘ। শত্রুরা আঘাত করার আগেই চণ্ডকের খড়্গ দ্বিখণ্ডিত করে শত্রুকে। যুদ্ধক্ষেত্রে চণ্ডক রুদ্র, অপ্রতিরোধ্য। শত্রুনিধনের নিপুণ কারিগর সে।

চণ্ডক শর্বকে তার সমকক্ষ যোদ্ধা বলে স্বীকার করে না। কাছের মানুষকে বলে, 'শর্ব আবার যোদ্ধা হলো কখন? চালায় তো তির। দূরের শত্রুদের তিরাঘাত করে। করুক না সে কাছের শত্রুর মোকাবিলা। তখন বুঝত যুদ্ধ কাকে বলে। নিরাপদ দূরত্বে অবস্থান নিয়ে যুদ্ধ করার মধ্যে এমন কী বাহাদুরি! আমার দিকে তাকাও। খরতর খড়্গ আমার হাতে, মহিষ আমার বাহন। মহারাজ ভীমের পাশে থেকে আমি প্রাণ বাজি রেখে যুদ্ধ করি। শ্রেষ্ঠ সমরনায়কের মর্যাদা যদি দিতে হয়, তাহলে আমাকে দাও। সেনাধিপতি কঙ্কণের পর আমার স্থান।'

স্তাবকেরা বলে, 'যথার্থ বলেছেন সমরনায়ক চণ্ডক। বরেন্দ্রি সূর্য ভীমের রাজ্যে আপনিই শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা।'

শর্বের বিয়ের আগে মহারাজ ভীম ন্যায়ধর্ম পালন করতে চেয়েছিলেন। দেবলার বড় সাধ জ্যেষ্ঠপুত্রকে বিয়ে করানোর। রামপালের সৈন্যরা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সীমান্তবর্তী এলাকায় ছোটখাটো আক্রমণ চালালেও গোটা কৈবর্তরাজ্যে সুখ ও শান্তি বিরাজমান। সীমান্তরক্ষীরা পাল সেনাদের প্রতিহত করছে। সীমান্তের সামান্য অশান্তি সমস্ত রাজ্যের শান্তিতে আঁচড় কাটতে পারছে না। রাজ্যজুড়ে নানা পেশার মানুষ। সবাই নিজ নিজ বৃত্তিতে লিপ্ত। প্রাচুর্যে এবং স্বস্তিতে প্রজাদের জীবনচর্যা চলছে। মহারাজা নির্বিঘ্নে রাজকার্যে মগ্ন।

এক রাতে দেবলা মহারাজ ভীমকে বললেন, 'ছেলেরা বড় হয়েছে। বড় ছেলে শর্বের বিয়ের বয়স হয়েছে। ঘরে ছেলের বউ আনো এবার।'

ভীম স্মিতমুখে বললেন, 'আর একটু অপেক্ষা করলে হতো না! সবেমাত্র বিশ পেরিয়েছে শর্বদেব। সমরবিদ্যায় এখনো পুরোপুরি অভিজ্ঞ হয়ে ওঠেনি সে। আর একটু সময় পেলে রণবিদ্যার দুর্বলতাগুলো কাটিয়ে উঠতে পারত। একটু পরে হোক বিয়েটা!'

'না, বিয়েটা তাড়াতাড়ি করাও। তরুণ বয়স, এই সময় নারীসঙ্গ বেশি কামনা করে পুরুষ। কেন, নিজের কথা মনে নেই তোমার?' শাড়ির আঁচল টানতে টানতে বলেন দেবলা।

ভীম দেবলার শাড়ির আঁচল টানাটা লক্ষ করেন। মুখে কৌতুকের হাসি ছড়িয়ে বলেন, 'তোমার আচরণ দেখে মনে হচ্ছে, তুমি ষোড়শী তরুণী।' তারপর কী যেন চিন্তা করলেন কিছুক্ষণ। আস্তে আস্তে বললেন, 'শর্বের বিয়ের ব্যাপারে আমার আপত্তি নেই। কিন্তু তার আগে যে আমার একটা কর্তব্য রয়ে গেছে।'

'কর্তব্য? কী সেটা?' অবাক কণ্ঠে দেবলা জিজ্ঞেস করেন।

ভীম আস্থার কণ্ঠে বললেন, 'তুমি তো জানো, চণ্ডক আমার সন্তানতুল্য। ছোটবেলা থেকে শর্বদেবের সঙ্গে চণ্ডককে বড় করে তুলেছি। দুজন একই সঙ্গে যৌবনপ্রাপ্ত হয়েছে। যদি বিয়ে করানোর প্রশ্ন ওঠে, তাহলে শর্বদেবের আগে চণ্ডককে বিয়ে করানো উচিত। চণ্ডক শর্বদেবের চেয়ে বছর পাঁচেকের বড়।'

দেবলা বললেন, 'চণ্ডকের বিয়ের ব্যাপারে আমার তো কোনো দ্বিমত নেই। প্রয়োজন বোধ করলে শর্বের সঙ্গেই তোমার চণ্ডকের বিয়ের আয়োজন করতে পারো। আমার কোনো আপত্তি নেই তাতে।'

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে ভীম বললেন, 'তাহলে আমি চণ্ডককে জিজ্ঞেস করি, বিয়েতে সে সম্মত আছে কি না? ও হ্যাঁ, তুমি কি বিয়ের ব্যাপারে শর্বদেবের সাথে কথা বলেছ?'

'আমি কী করে কথা বলি বলো! শাশুড়িমাতাকে দিয়ে বলিয়েছি। শর্ব অসম্মত নয় বলে মা জানিয়েছেন। তবে প্রথম দিকে একটু ওজর-আপত্তি করেছে, এই আর কি,' দেবলা বললেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভীম জিজ্ঞেস করলেন, 'কী ওজর-আপত্তি?'

'ওই আর কি, আমার কতই বা বয়স হয়েছে? সমরবিদ্যায় আমি এখনো পুরোপুরি দক্ষ হয়ে উঠিনি। বিয়ে করলে আমার জীবন ঘরমুখী হয়ে যাবে—এসব আর কি,' হালকা কণ্ঠে দেবলা বললেন।

ভীম বললেন, 'যা-ই হোক, শেষ পর্যন্ত রাজি হয়েছে তো শর্বদেব?'

দেবলা বললেন, 'শাশুড়িমাতা তো রাজির কথাই বললেন। হাসতে হাসতে তিনি এ-ও বলেছেন, নবীন বয়স ঘৃতকুম্ভের মতো! মায়ের শেষের কথাটি বুঝতে পারিনি।'

'যাক, তোমার ওসব বোঝার দরকার নেই,' স্মিত হেসে ভীম বলেছিলেন।

পরদিন চণ্ডককে ডেকে পাঠিয়েছিলেন মহারাজ ভীম। মাথা নিচু করে দাঁড়িয়েছিল চণ্ডক। ভীম সরাসরি কথা বলেছিলেন চণ্ডকের সঙ্গে। ভীম বলেছিলেন, 'দেখো চণ্ডক, কালে কালে মানুষ যৌবনপ্রাপ্ত হয়। বাবা-মায়ের দায়িত্ব সন্তানদের শিক্ষিত করে গড়ে তোলা। আমার বিশ্বাস, তুমি শাস্ত্রবিদ্যা যেমন অর্জন করেছ, তেমনি সমরবিদ্যাও তোমার ভালো করে জানা হয়েছে। নানা যুদ্ধক্ষেত্রে আমার পাশে পাশে থেকে তুমি তার প্রমাণ দিয়েছ বারবার।'

চণ্ডক মহারাজ ভীমের এসব কথার মাহাত্ম্য বুঝতে পারে না। কুণ্ঠিত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করে, 'আমি আপনার এসব কথার মানে বুঝতে পারছি না, মহারাজ। কেন এসব কথা...।'

ভীম ডান হাত তুলে চণ্ডককে থামিয়ে দিলেন। বললেন, 'আমার কথা এখনো শেষ হয়নি চণ্ডক। শেষ পর্যন্ত শুনলে আমার কথা বুঝতে পারবে তুমি।' তারপর চণ্ডকের চোখে চোখ রেখে বললেন, 'যৌবনপ্রাপ্ত হলে সন্তানদের বিয়ে করানোও পিতা-মাতার কর্তব্য। সেই ছোটবেলা থেকে তোমাকে আমি সন্তানের মর্যাদা দিয়ে আসছি। তুমি এখন যৌবনপ্রাপ্ত হয়েছ। তুমি, শর্বদেব—দুজনেরই বিয়ে করার বয়স হয়েছে। আমি তোমাকে বিয়ে করাতে চাই।' শর্বকে বিয়ে করানোর ব্যাপারে দেবলার প্রস্তাবের কথাটি চেপে যান ভীম।

এবার চণ্ডক মাথা নিচু করল। কী যেন ভাবল কিছুক্ষণ। তারপর দৃঢ়কণ্ঠে বলল, 'আমি এখন বিয়ে করব না, মহারাজ।' তারপর স্বগত কণ্ঠে বলল, 'আমি বিয়ে করতে পারি না।'

নিম্নকণ্ঠে চণ্ডক শেষের কথাটা বললেও ভীম তা শুনে ফেললেন। জিজ্ঞেস করলেন, 'কেন, কেন বিয়ে করতে পারো না তুমি?'

চণ্ডক নিচুস্বরে বলে, 'কারণ...।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'কী কারণ?' ভীম ব্যগ্র কণ্ঠে জিজ্ঞেস করেন।

'কারণ আপনাকে বলা যাবে না।'

'কেন বলা যাবে না?'

'পিতা আর সন্তানের মধ্যে এ বিষয়ে কথা হতে পারে না।'

'আমি তোমার জন্মদাতা পিতা নই বটে, পিতৃতুল্য তো? পিতা যদি পুত্রকে বন্ধু মানে, তাহলে এমন কোনো কথা নেই যা উভয়ের মধ্যে হতে পারে না।'

'তার পরও আমি নিরুপায়। আমাকে মাফ করবেন। আমি যেতে চাই মহারাজ।'

'তাহলে তুমি আমাকে পিতার সম্মান দাও না?' আহত কণ্ঠে ভীম বললেন।

চণ্ডক নরম কণ্ঠে বলল, 'পুত্রের প্রতি পিতার যা কর্তব্য, তার চেয়ে অধিক দায়িত্ব আমার জন্য আপনি সম্পন্ন করেছেন। তার পরও আমি নিরুপায়, মহারাজ।' খুব ছোটবেলা থেকে ভীমকে সবাই মহারাজ বলে ডাকতে শুনে এসেছে চণ্ডক। ভীম চণ্ডকের বাবা ডাক আগ্রহভরে শুনতে চাইলেও কেন জানি চণ্ডক কোনো দিন ভীমকে বাবা বলে সম্বোধন করেনি।

ভীম একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে ব্যথিত কণ্ঠে বললেন, 'আচ্ছা ঠিক আছে! কারণটা তুমি আমাকে না-ই বলো, কিন্তু বিয়ে করার ব্যাপারে তোমার আকাঙ্ক্ষা যেদিন জাগবে, সেদিন আমাকে বলবে—এই অনুরোধ রইল তোমার কাছে।'

ভীমের মুখে অনুরোধ শব্দটি শুনে চণ্ডকের মধ্যে ভাবান্তর হলো। বেদনা ছেয়ে গেল তার সারা মুখে। ভীমকে চণ্ডক কী করে বোঝাবে যে তার অন্তরজুড়ে আছে মোহনা—বারাঙ্গনাপল্লির ওই শ্যামবর্ণা মোহনা!

চণ্ডক বিদায় নিলে মহারাজ ভীম গুপ্তচর-প্রধানকে ডেকে পাঠালেন। গুপ্তচর-প্রধান এলে বললেন, 'কৃপাসিন্ধু, আমাকে একটা সংবাদ এনে দিতে হবে। তবে একটি শর্ত আছে।'

কৃপাসিন্ধু বিনীতভাবে জিজ্ঞেস করলেন, 'কী সংবাদ, মহারাজ? কী শর্ত?'

'শর্তের কথা আগে বলি, ব্যাপারটি যাতে কেউ জানতে না পারে। লোকচক্ষু এবং কর্ণের অন্তরালে কাজটি সম্পন্ন করতে হবে,' ভীম বললেন।

কৃপাসিন্ধু বললেন, 'কী সংবাদ সংগ্রহ করতে হবে, মহারাজ?'

ওঁরা দুজন ছাড়া মন্ত্রণাকক্ষে কেউ নেই। তার পরও এদিক-ওদিক তাকালেন ভীম। নিচুকণ্ঠে বললেন, চণ্ডকের চলাচলের ওপর কড়া নজর রাখতে হবে। ও কখন কোথায় যায়—এই আর কি!'

'আচ্ছা মহারাজ।' কৃপাসিন্ধু মুখে বললেও তাঁর চেহারা দেখে মনে হচ্ছে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাজার আদেশের মর্মার্থ তিনি সঠিকভাবে বোঝেননি।

ভীমও সেটা অনুধাবন করলেন। জিজ্ঞেস করলেন, 'কৃপাসিন্ধু, তুমি কি আমার কথার মাহাত্ম্য বুঝতে পেরেছ?'

কৃপাসিন্ধু আমতা আমতা করে বললেন, 'সঠিক বুঝতে পারিনি, মহারাজ। সেনাপতি চণ্ডক তো আমাদের সন্দেহের তালিকায় নেই। তাঁর সম্পর্কে কী সংবাদ নিতে বলছেন, সঠিক বুঝতে পারিনি।'

'তোমার কোনো দোষ নেই, কৃপাসিন্ধু। আমি তো তোমার কাছে সবকিছু খুলে বলিনি।' তারপর তিনি হাতের ইশারায় কৃপাসিন্ধুকে আরও কাছে ডাকলেন। নিচুস্বরে বললেন, 'চণ্ডক তো আমার সন্তানতুল্য, সেটা তুমি জানো। সে এখন যৌবনপ্রাপ্ত হয়েছে। বিয়ের বয়স এখন তার। কিন্তু বিয়েতে তার প্রচণ্ড অনীহা। এটা অস্বাভাবিক। আমার মনে হয়, ভেতরে অন্য কোনো কারণ আছে। সেই কারণের কিছুটা আমি জানি। কিন্তু একজন রাজপুত্রের জন্য সেটা বিয়ে না করার কারণ হতে পারে না।' তারপর দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, 'একজন রাজপুত্র কিছু সময়ের জন্য ভাবাবেগে পড়ে অন্যের প্রতি আসক্ত হতে পারে। তবে সেটা ক্ষণিক সময়ের জন্য। যা-ই হোক, তুমি যত শিগগির পারো রাতবিরাতে চণ্ডকের গমনাগমন সম্পর্কে আমাকে অবগত করাও।'

কৃপাসিন্ধুর কাছে ব্যাপারটা স্পষ্ট হয়ে গেল। মস্তক আনত করে বললেন, 'ঠিক আছে, মহারাজ।'

দ্রুত পায়ে কৃপাসিন্ধু কক্ষ থেকে নিষ্ক্রান্ত হলেন।

সাড়ম্বরে বিয়েটা হয়ে গেল শর্বদেবের। মহিষী দেবলা বলেছেন, ধুমধাম করে হওয়া চাই বিয়েটা। হাজার হলেও আমার প্রথম ছেলের বিয়ে। মহারাজ ভীম শর্বদেবের বিয়ের আয়োজনে কার্পণ্য করেননি। ডমরনগরের রাজপ্রাসাদ সেদিন অপার সৌন্দর্যে সেজেছিল। রাজা, অমাত্য, প্রহরী, সৈনিক, দাসী—সবারই গায়ে নতুন পোশাক। প্রজারাও এসেছিল সে রাতে, হাজারে হাজারে। রাজপ্রাসাদের ফটক সে রাতে অবারিত ছিল। রাজ্যের ধনবান ব্যক্তিরা, বণিকেরা মূল্যবান উপহার নিয়ে হাজির হয়েছিল শর্বদেবের বিয়েতে। সবার জন্য রাজপ্রাসাদের রসুইখানায় খাবার তৈরি হয়েছিল। যার যার মর্যাদার জায়গায় বসে ভোজন সম্পন্ন করেছিল অতিথিরা। রাজা ভীমের সব পুত্রকে বরের সাজে সাজানো হয়েছিল, চণ্ডকও বাদ যায়নি সে সাজ থেকে।

রাজপ্রাসাদের সর্বত্র, ডমরনগরের সর্বত্র, রাজ্যের সর্বত্র আনন্দের ছড়াছড়ি। সবারই মনে আনন্দের জোয়ার। কিন্তু চণ্ডকের মনে আনন্দ নেই,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অশান্তির তীক্ষ্ণ কাঁটা তার মনকে বিদ্ধ করে চলেছে।

মহিষী দেবলার 'হাজার হলেও আমার প্রথম ছেলের বিয়ে' কথাটি চণ্ডকের কানে পৌঁছে গিয়েছিল। সেই ছোটবেলা থেকে চণ্ডক অনুভব করে এসেছে, রাজমহিষীর মধ্যে তার জন্য স্নেহের কোথায় যেন একটু খামতি আছে। খুব ছোটবেলায় না বুঝলেও গায়ে-গতরে একটু বড় হলে চণ্ডক তা অনুধাবন করতে শুরু করেছিল। খাওয়ানোর সময়, পরানোর সময়, এমনকি বসানোর সময়ও দেবলার পক্ষপাতিত্বটুকু চণ্ডক বুঝতে পারত। শর্বদেবসহ অন্যান্য ছেলের জন্যই মহিষীর সিংহভাগ ভালোবাসা, আর এক চিমটি কৃত্রিমতায় মোড়ানো ভালোবাসা যেন চণ্ডকের জন্য। সেই বাল্যবয়স থেকে চণ্ডকের মনে দেবলার জন্য একটুখানি ঘৃণা জায়গা করে নিয়েছিল। সেই ঘৃণাটুকু ধীরে ধীরে বীজ থেকে মহিরুহ হয়েছে চণ্ডকের মধ্যে। কিন্তু চণ্ডক বড় চালাক। সে ঘুণাক্ষরেও না মহারাজ ভীমকে, না মহিষী দেবলাকে তার বুঝতে পারার ব্যাপারটি বুঝতে দেয়নি।

আর আজ এটা তো স্পষ্টই হলো, চণ্ডক এই রাজপরিবারের কেউ না। মহারাজ ভীমেরও দোষ কম কোথায়? এখন এই বিয়ের রাতে, ভীমের বিরুদ্ধেও অভিযোগ চণ্ডকের মনে ঘূর্ণি দিয়ে উঠল। তিনি তো আমাকে পিতৃস্নেহে রাস্তা থেকে কুড়িয়ে এনেছিলেন। বিয়ের আগেই তো এই আমি চণ্ডক ভীমকে পিতৃত্বের স্বাদ দিয়েছিলাম। কিন্তু কই, তিনি তো পিতার কর্তব্য সঠিকভাবে পালন করলেন না। শুধু পিতা, পিতৃস্নেহ, পিতৃত্ব—এসব গালভরা কথা বলে তিনি বিভ্রান্ত করেছেন সবাইকে। কাজের ক্ষেত্রে তিনি কিসের পরিচয় দিলেন? পরিচয় দিলেন—চণ্ডক তাঁর সন্তান নয়, চণ্ডক রাস্তায় কুড়িয়ে পাওয়া ছেলে। নইলে কেন তিনি শুধু একবার জিজ্ঞেস করেই ক্ষান্ত হলেন? তিনি পিতার কর্তব্যের কথা বললেন, পিতৃস্নেহের কথাও বললেন। না করার অধিকার তো চণ্ডকের আছে। না হয় চণ্ডক যৌবনদোষে বারাঙ্গনাগামী হয়েছে, না হয় মোহনার শরীরের স্বাদ পেয়ে চণ্ডক উদ্‌ভ্রান্ত হয়েছে, তার পরও তো পিতার কর্তব্য ছিল—এসব থেকে পুত্রকে ফিরিয়ে আনার। মহারাজ তা করলেন না। কেন বিয়ে করতে চাইলাম না, তার অনুসন্ধানটুকুও করলেন না মহারাজ। শুধু বললেন কি, শুধু বললেন, 'বিয়ে করার ব্যাপারে তোমার আকাঙ্ক্ষা যেদিন জাগবে, সেদিন আমাকে বলবে।' ব্যস, এতেই পিতার কর্তব্য শেষ হয়ে গেল? তিনি দ্বিতীয়বার কোনো জোরাজুরি করলেন না, বললেন না—দেখো চণ্ডক, তুমি আমার বড় ছেলে। বড় ছেলেকে আগে বিয়ে করাতে হয়—এটাই সমাজের, এই রাজপরিবারের নিয়ম। তোমাকেই প্রথমে বিয়ে করতে হবে। তুমি যদি রাজি না

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হও, তাহলে শর্বেরও বিয়ে হবে না—এই আমার শেষ কথা। তা তিনি বললেন না। যদি আমার ওপর জোর খাটাতেন, তাহলে তো বিয়েতে আমি সম্মত হতামই। মোহনা? মোহনার কী হতো তখন? মোহনাও থাকত আমার হয়ে। একজন রাজপুত্রের কি একাধিক শয্যাসঙ্গিনী থাকতে পারে না? অবশ্যই পারে। বঙ্গদেশের পূর্বের পূর্বের ইতিহাস তো তা-ই বলে। আমারও দুজন শয্যাসঙ্গিনী থাকত—একজন ঘরের, একজন বাইরের। প্রাসাদের নিয়ম-নৈতিকতার মধ্যে আমি যখন হাঁপিয়ে উঠতাম, ক্লান্তি যখন আমাকে জড়িয়ে ধরত, আমি না হয় মোহনাকে জড়াতে যেতাম! তাতে তো কোনো অপরাধ হতো না! স্ত্রী আমাকে বন্ধনের স্বাদ দিলে, মোহনা আমাকে মুক্তির রসে সিক্ত করত। এতে তো কোনো অপরাধ দেখি না আমি। আমি অপরাধ দেখি মহারানির পক্ষপাতিত্বে, ভীমের আচরণে। মহারাজ ভীম কি সত্যি আমাকে ভালোবাসেন, সত্যিই কি তিনি আমাকে পুত্রের মর্যাদা দেন? আমি তা বিশ্বাস করি না।

শর্বরা যখন যুবক হয়ে উঠল, তখন রাজপ্রাসাদের মূল অংশেই তাদের আলাদা আলাদা থাকার ব্যবস্থা হলো। চণ্ডকের সেখানে ঠাঁই হলো না। নিজ সন্তানদের সঙ্গে কুড়িয়ে পাওয়া চণ্ডক একই ছাদের নিচে জীবনযাপন করুক—এটা কিছুতেই মেনে নিতে রাজি হননি মহিষী দেবলা। তাঁরই চাপাচাপিতে রাজপ্রাসাদ থেকে দু'কদম দূরে আলাদা করে একটা বাড়ি তৈরি করলেন ভীম। ওই বাড়িতে সবকিছু আছে, কিন্তু রাজপ্রাসাদের মতো প্রাণ নেই। রাজপ্রাসাদে আত্মীয় আছে, স্বজন আছে আর আছে পারিবারিক বন্ধন-ভালোবাসা। এই নতুন বাড়িতে প্রয়োজনের সবকিছু থরে থরে সাজানো, কিন্তু নেই পরিবার-পরিজনের নিবিড় ভালোবাসা। এই ভালোবাসাহীন প্রাসাদে চণ্ডকের বসবাসের ব্যবস্থা করলেন ভীম। হয়তো চণ্ডকের স্বকীয়তার মর্যাদা দিতেই তিনি এই ব্যবস্থা করেছেন। ভাবেননি, পৃথক বসবাসের এই ব্যবস্থার ফলে চণ্ডকের ভেতরে হাহাকারের সৃষ্টি হবে।

চণ্ডকের মধ্যে সত্যি প্রচণ্ড একটা হাহাকারের সৃষ্টি হলো। এই হাহাকার একসময় অভিমানে রূপ নিল। কালক্রমে এই অভিমান ক্ষোভে রূপান্তরিত হলো। বুদ্ধিমান চণ্ডক তার ভেতরের হাহাকার-অভিমান-ক্ষোভকে কখনো বুঝতে দেয়নি রাজমহিষী বা মহারাজ ভীমকে।

শর্বের বিয়ে চণ্ডকের হৃদয়ে একটা গভীর ক্ষতের সৃষ্টি করল। কেন জানি তার মনে হতে লাগল—শর্বই তার সব সুখ, উন্নতি, উচ্চাকাঙ্ক্ষার অন্তরায়। শর্ব না থাকলে ভীমের সব ভালোবাসা তাকে ঘিরেই আবর্তিত হতো। কপর্দী তো শাস্ত্রপাগল আর শম্ভু পড়ে আছে মাংসপেশির পরিচর্যা নিয়ে। তাদের কেউ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাজকার্যে বা যুদ্ধে আগ্রহী নয়। রাজকার্যে এবং যুদ্ধে বিচক্ষণতা ও কৃতিত্বের পরিচয় দিলেও শর্বের কারণে সব প্রশংসা সে পায় না। পারিষদরা আর প্রধান সেনাপতি কঙ্কণ চণ্ডকের সামনেই শর্বের ভূয়সী প্রশংসা করে থাকেন। রাজা ভীমের কাছে মিথ্যা তথ্য পরিবেশন করে অমাত্যরা চণ্ডকের কৃতিত্বকে খর্ব করে শর্বকে উচ্চাসন দেন। চণ্ডক তো রক্তমাংসের মানুষ! তার তো সহ্যের একটা সীমা আছে! শর্বের প্রতিবন্ধকতায় ভেতরে ভেতরে জ্বলতে থাকে চণ্ডক।

এই জ্বলুনি তীব্র হয়ে উঠল শর্বের বিয়ের রাতে। বিয়ের অনুষ্ঠানে ঘুরে ঘুরে চণ্ডক অতিথি-অভ্যাগতদের সঙ্গে বাক্যবিনিময় করল, ভোজনস্থলে গিয়ে খাবার পরিবেশনে তদারকি করল, শর্বের মুখোমুখি হয়ে কৃত্রিম হাসি মুখে ঝুলিয়ে রাখল। কিন্তু বিয়ের আসরে শর্বের স্ত্রীকে একনজর দেখেই তার মধ্যে উথালপাথাল ভাব জেগে উঠল। আরে, এই বউ তো আমারই হতে পারত! রাজা যদি যথাযথভাবে ন্যায়ধর্ম পালন করতেন, বড় সন্তানকে প্রথমে বিয়ে করাতেন, তাহলে তো আজকে শর্বের বিয়ে না হয়ে আমার বিয়ে হতো, ওই সুন্দরী বউটি শর্বের পাশে না শুয়ে আমার শয্যাসঙ্গিনী হতো।

শয্যার কথা মনে পড়তেই চণ্ডকের মোহনার কথা মনে পড়ে গেল। মোহনার শরীর-বাঁকের কথা স্মরণে এল। তার সোহাগি চাহনি, তার শরীরের উষ্ণতার স্মৃতি চণ্ডকের দেহ-মনকে চঞ্চল করে তুলল। তখন এই বিয়ে, এই সাড়ম্বর অনুষ্ঠান, এই গণ্যমান্যদের উপস্থিতি তার কাছে অর্থহীন বলে মনে হলো। চণ্ডক রওনা দিল বারাঙ্গনাপল্লির দিকে, মোহনার শরীর-উষ্ণতার দিকে। তার দেহরক্ষীরা নীরবে তাকে অনুসরণ করল।

কৃপাসিন্ধু মহারাজের নিকটবর্তী হয়ে চোখেমুখে কী যেন একটা ইশারা করলেন। ভীম কৃপাসিন্ধুকে নিয়ে নির্জন জায়গায় সরে এলেন। জিজ্ঞেস করলেন, 'কৃপাসিন্ধু, তুমি আমাকে গোপনীয় কিছু বলতে চাও?'

'হ্যাঁ মহারাজ, আমি চণ্ডক সম্পর্কেই আপনাকে বলতে চাই।' মহারাজ ভীম কৃপাসিন্ধুর আরও নিকটে সরে এলেন। কৃপাসিন্ধু চণ্ডকের মোহনাগমনের ব্যাপারটি সংক্ষেপে বর্ণনা করলেন। আজকের ব্যাপারটিও ভীমকে জানালেন কৃপাসিন্ধু। ভীম বোবা চাহনিতে অনেকক্ষণ কৃপাসিন্ধুর দিকে তাকিয়ে থাকলেন। তারপর বুক চিরে একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করলেন। তারপর কৃপাসিন্ধুকে বললেন, 'তুমি যাও এখন, কৃপাসিন্ধু। আমার শর্তের কথা মনে রেখো।'

কৃপাসিন্ধু যেতে যেতে ভীমের কণ্ঠ শুনলেন, 'মানুষ তাহলে সত্যিই জন্মের অপরাধ থেকে বেরিয়ে আসতে পারে না!'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাত

রাজপ্রাসাদের মন্ত্রণাসভায় দুজন মুখোমুখি বসেছেন—মথনদেব আর রামপাল। মথনদেব রামপালের মাতুল। বিচক্ষণ কূটনীতিক। অঙ্গদেশের সামন্ত। যুদ্ধের সময় বলে পুত্রের হাতে সাময়িকভাবে শাসনভার তুলে দিয়ে ভাগিনেয় রামপালের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। মাথা ভরা বাবরিচুল। ধবধবে সাদা। উজ্জ্বল গৌরবর্ণ তাঁর। বয়স তাঁর চামড়ায় কোনো রেখাপাত করতে পারেনি। মথনদেব জানেন, রণক্ষেত্রের চেয়ে মন্ত্রণাসভা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। পরিকল্পনা যদি সঠিক হয়, বাস্তবায়নে যদি যথার্থতা থাকে, তাহলে যুদ্ধজয় সহজতর হবে—এটা নিশ্চিত। তিনি মনে করেন, রামপালের আমলে কৈবর্তদের বিরুদ্ধে যতগুলো যুদ্ধাভিযান হয়েছে, সেখানে কোনো বিচক্ষণ পরিকল্পনা ছিল না। পরিকল্পনাহীন যুদ্ধাভিযান তাই পরাজয়ে পর্যবসিত হয়েছে বারবার। তিনি বিশ্বাস করেন, রামপাল বুদ্ধিশক্তির চেয়ে পেশিশক্তিকে গুরুত্ব দেন বেশি। পেশিশক্তি যে বুদ্ধিশক্তির কাছে ঠুনকো কাচের মতো, সেটা রামপালকে বোঝানো দরকার। মথনদেবের আগ্রহেই আজ এই অপরাহ্নে মন্ত্রণাসভায় এসেছেন রামপাল। মথনদেবের অনুরোধে একা এসেছেন। মথনদেব বলেছেন, 'একা এসো। কথা হবে তোমাতে-আমাতে।'

মন্ত্রণাসভার বাতায়ন দিয়ে তির্যক আলো ঢুকেছে। আলোর প্রয়োজন নেই বলে প্রদীপ জ্বালানো হয়নি। অপরাহ্নের ম্লান আলোতে কক্ষটি আলোকিত। রামপাল নির্ধারিত আসনে আসীন, ঘনিষ্ঠ হয়ে বসেছেন মাতুল মথনদেব।

মথনদেব ভূমিকা না করে বললেন, 'তোমার বাবা বিগ্রহপাল বুদ্ধিমান ছিলেন না।'

'কেন মাতুল, কেন এ কথা বলছেন?' থতমত গলায় রামপাল জিজ্ঞেস করলেন।

'দুর্ভাগাও ছিলেন তিনি,' রামপালের প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে মথনদেব আপন মনে আবার বললেন।

রামপাল এবার কথা বললেন না, উৎসুক দৃষ্টিতে মথনদেবের দিকে তাকিয়ে থাকলেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মথনদেব ধীরে ধীরে বলতে শুরু করলেন, 'দুর্ভাগ্যটা শুরু হয়েছিল নয়পালের আমল থেকে। কলচুরীরাজ কর্ণ পালরাজ্য আক্রমণ করেছিল। দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের মধ্যস্থতায় সন্ধি স্থাপিত হলেও তৃতীয় বিগ্রহপাল, মানে তোমার বাবার আমলে চুক্তি ভেঙে কর্ণ দ্বিতীয়বার এই বঙ্গভূমি আক্রমণ করে। বীরভূম পর্যন্ত দখল করে নেয় কর্ণ। এই যে ভাঙল পালরাজ্য, আর জোড়া লাগেনি। পরে তোমার পিতা কর্ণের হাত থেকে হারানো রাজ্যের কিছু অংশ উদ্ধার করেছিলেন বটে, কিন্তু ঈশ্বর ঘোষ নামের এক সামন্ত এ সময় মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। ঈশ্বর ঘোষকে দমন করতে পারেননি বিগ্রহপাল। পাল রাজা বিগ্রহপাল হারানো পূর্ববঙ্গ আর কখনো উদ্ধার করতে পারেননি। দুর্ভাগা তিনি।'

'বাবাকে বুদ্ধিহীন বললেন কেন? ঈশ্বর ঘোষকে দমন করতে না পারার সঙ্গে পিতৃদেবের নির্বুদ্ধিতার সম্পর্ক কী?' আহত কণ্ঠ রামপালের।

'বিগ্রহপালের প্রধান অমাত্যের এক রূপসী কন্যা ছিল, ঈশ্বর ঘোষের পুত্রের মনে ধরেছিল ওই কন্যাকে। প্রস্তাব পাঠিয়েছিল সে। প্রধান অমাত্য ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেছিল তার সে প্রস্তাব। বিগ্রহপালের আনুকূল্য চেয়েছিল। কিন্তু বিগ্রহপাল মহামাণ্ডলিক এই সামন্তরাজার অনুরোধে কর্ণপাত করেননি। ব্যর্থ হয়েছিল সে। আত্মহত্যা করেছিল তার পুত্র। ফলে ঈশ্বর ঘোষ হিংস্র হয়ে উঠেছিল, কর দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছিল। শেষ পর্যন্ত অস্ত্র হাতে তুলে নিয়েছিল সে।' একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে মথনদেব আবার বললেন, 'তোমার বাবা যদি বুদ্ধিমান হতেন, তাহলে তার প্রস্তাবে প্রধান অমাত্যকে রাজি করাতেন। কী আসত-যেত প্রধান অমাত্যের কন্যাকে তার ছেলের সঙ্গে বিয়ে দিলে? তোমার বাবার সামরিক শক্তি তখন মৃতপ্রায়। বুদ্ধিহীন লোক না হলে কি এ রকম করেন?' নির্বাক রামপাল মাতুলের দিকে তাকিয়ে থাকলেন গভীর চোখে।

মথনদেব বললেন, 'আর তোমার বড় ভাই দ্বিতীয় মহীপাল ছিল বড় সন্দেহপরায়ণ, হিংসুটেও ছিল সে। কোপন স্বভাবের মহীপাল অমাত্যদের মর্যাদা দিত না।'

ভাইয়ের স্বভাব সম্পর্কে রামপালের অনেক কিছু জানা। ভাইয়ের জন্য রামপালের মধ্যে ক্রোধ জমা ছিল। কারাগারে ধুঁকতে ধুঁকতে সেই ক্রোধ প্রচণ্ড থেকে প্রচণ্ডতর হয়েছে। মনে মনে ঠিক করে রেখেছিলেন, কোনো দিন যদি এই বন্দিত্ব থেকে মুক্তি পান, তাহলে কড়ায়গন্ডায় প্রতিশোধ নেবেন। কিন্তু দিব্যোক তা হতে দেননি। দিব্যোক পরোক্ষভাবে কারাগার থেকে রামপাল আর শূরপালকে মুক্তির ব্যবস্থা করেছেন, কিন্তু প্রতিশোধ গ্রহণের কোনো সুযোগ রাখেননি। দিব্যোক মহীপালকে হত্যা করে রামপালের প্রতিশোধ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নেওয়ার বাসনা রুদ্ধ করে দিয়েছেন।

মথনদেব যেন রামপালের ভাবনা বুঝতে পারলেন। বললেন, 'দেখো ভাগিনা, তিন ভাই তোমরা একত্রে বড় হয়ে উঠলে, নিয়ম তো পাল বংশে আছেই, পিতার অবর্তমানে বড় ভাই রাজা হবে। কিন্তু মহীপালের মনে প্রবল সন্দেহ। যদি তার ব্যত্যয় ঘটে, যদি ভাইয়েরা কেউ ষড়যন্ত্র করে! এটা তো সত্যি যে, ভাইদের মধ্যে শাসক হিসেবে তুমিই বেশি উপযুক্ত।'

'আমার মনে তো কোনো দুরভিসন্ধি ছিল না! বড় ভাইয়ের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করব! তাঁকে সিংহাসনচ্যুত করব!' রামপাল বললেন।

'কিন্তু তোমার ভাই সেটা বিশ্বাস করেনি। সন্দেহের বশবর্তী হয়ে তোমাদের বন্দী করল। তবে তোমাদের বন্দী করার আরও একটা কারণ ছিল।'

'কী সেটা?'

'সৎ পরামর্শ। সৎ পরামর্শ দেওয়াটাই তোমাদের কাল হয়েছে।'

'কোন সৎ পরামর্শের কথা বলছেন আপনি?'

মথনদেব বললেন, 'সামন্ত বিদ্রোহ দমনের জন্য মহীপাল যুদ্ধাভিযান করতে চাইল। অমাত্যরা তাকে ভুল তথ্য দিল। প্রচুর সৈন্য আছে তোমাদের, তোমাদের সৈন্যবাহিনী প্রবলপ্রতাপী, স্বর্ণ-মণি-মুক্তা-কড়িতে তোমাদের রাজকোষ পূর্ণ। যুদ্ধাভিযানে সৈন্য এবং অর্থ—এ দুটো অপরিহার্য। মিথ্যা তথ্যে বিভ্রান্ত হলো মহীপাল। কিন্তু তোমরা বাস্তব অবস্থা জানতে। তোমরা জানতে তোমাদের সৈন্যবাহিনী ক্ষীণকায়, সৈন্যরা বিপন্ন, ক্লান্ত আর রাজকোষ শূন্যের কোঠায়। যুদ্ধাভিযান না করার জন্য তোমরা সৎ পরামর্শ দিলে। সেই সৎ পরামর্শের ফল পেলে তোমরা, কারাগারে নিক্ষিপ্ত হলে। আর একটা কথা কি তোমার মনে আছে?'

'কোন কথা?' রামপাল আগ্রহভরে জানতে চাইলেন।

'ওই দিব্যোকের কথা। দিব্যোক এই পাল বংশের যথার্থ বন্ধু ছিল এক সময়। সে সামন্ত ছিল, কিন্তু পাল রাজার অনুগত সামন্ত। পালদের বিপদে এবং আনন্দে সর্বদা সে মহীপালের কাছাকাছি থাকত। সুহৃদ ছিল সে পাল বংশের। তোমার মতো মহীপালের সামরিক শক্তির বিপর্যস্ততার কথা দিব্যোকেরও অজানা ছিল না। তাই যুদ্ধাভিযানে সে-ও বাধা দিয়েছিল। পরিণাম কী হয়েছে, তা তোমার অজানা নয়।' মথনদেব বললেন।

রামপাল বললেন, 'সবকিছু মানলাম। তাই বলে দাদাকে হত্যা! দিব্যোকের এত বড় কৃতঘ্নতা, এত বড় দুঃসাহস!' দিশেহারা কণ্ঠ রামপালের।

'শোনো রামপাল, তুমি আমার একটা প্রশ্নের জবাব দাও।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'কী প্রশ্ন?'

'দিব্যোক কি প্রথমে আক্রমণ করেছিল পালরাজ্য?'

'না, তা অবশ্য করেনি।'

'কোপন স্বভাবী মহীপাল ছিল আত্মম্ভরী। নিজের সামরিক শক্তির আন্দাজ না করে বরেন্দ্রি আক্রমণ করে বসল মহীপাল। দিব্যোক আগেই বুঝে গিয়েছিল—রামপাল বরেন্দ্রি আক্রমণ করবে একদিন। তার প্রজাদের ডাক দিয়েছিল সে। তার ডাকে কামার-কুমোর, জেলে, ব্যাধ—এরা, সেই নিচু জাতের মানুষগুলো একত্র হয়েছিল। যুদ্ধে নাস্তানাবুদ হয়েছিল মহীপাল। শেষে দিব্যোকের তলোয়ারের আঘাতে দ্বিখণ্ডিত হলো সে।'

'বড় অন্যায় করেছে দিব্যোক! এই অন্যায় মর্মান্তিক, হৃদয়বিদারক!' ব্যাকুল কণ্ঠে বললেন রামপাল।

মথনদেব বললেন, 'তোমার দিক থেকে হয়তো মর্মান্তিক, কিন্তু দিব্যোকের দিক থেকে? দিব্যোক যদি পরাজিত হতো, তাহলে তার মস্তক ধড়চ্যুত হতো, বরেন্দ্রির রাজধানী আর জনপদকে শ্মশানে পরিণত করত মহীপাল। এতে অবশ্য একটা লাভ হতো—ভারতবর্ষের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাজবংশের হাতেই শাসনক্ষমতা থাকত।'

ব্যগ্রকণ্ঠে রামপাল বলে উঠলেন, 'আপনি ঠিকই বলেছেন, মাতুল। জ্যেষ্ঠ যদি যুদ্ধে জয়লাভ করত, তাহলে এই ছোটলোকদের হাতে ক্ষমতা চলে যেত না। দাদার পরাজয়ের মাশুল গুনছি আমি। ছোটলোক কৈবর্তরা শাসন করছে বরেন্দ্রি, আমাদের জনকভূমি। তাই তো মনস্থ করেছি, এই ছোটলোকদের আমি পায়ের তলায় পিষে মারব। দিব্যোক তো মরেছে, ভীম এখন কৈবর্তদের পান্ডা। তার মুণ্ড যেদিন মাটিতে গড়াবে, সেদিনই আমার শান্তি!'

'ভাগিনেয়, তুমি ভুল বলছ, এক অর্থে এই কৈবর্তরা তোমার শত্রু নয়। কৈবর্তরাজ দিব্যোক তোমার ভাইকে হত্যা না করলে তুমি কোথায় থাকতে? অন্ধকার কারাগারে অথবা পরলোকে। তার কল্যাণেই তুমি পাল রাজা হতে পেরেছ। সেই অর্থে তুমি কৃতঘ্ন। যে দিব্যোক তোমার উপকার করেছে, তার বংশ নিপাত করার জন্য তুমি আজ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়েছ,' বললেন মথনদেব।

'হ্যাঁ মাতুল, আমি ভীমকে নির্বংশ করার প্রতিজ্ঞা নিয়েছি।'

মথনদেব বললেন, 'এইখানে তোমার ভ্রাতার মতো আরেকটা ভুল করেছ তুমি।'

'কী ভুল?'

'মহীপাল যেমন দিব্যোকের শক্তির সন্ধান না নিয়ে বরেন্দ্রি আক্রমণ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করেছিল, তুমিও ভীমের শক্তি সম্পর্কে ভালো করে খোঁজখবর না নিয়ে ভীমের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছ।'

রামপাল বললেন, 'তার সৈন্যবাহিনী সম্পর্কে আমাদের গুপ্তচর সঠিক সংবাদ দিয়েছে।'

'সৈন্যশক্তি সম্পর্কে সঠিক সংবাদ দিয়েছে হয়তো, কিন্তু তোমার গুপ্তচর বাহিনী ভীমের জনশক্তি সম্পর্কে কোনো সংবাদ রাখে না।' তারপর চোখ কুঁচকে মথনদেব বললেন, 'যুদ্ধের সময় তুমি সৈন্য ভাড়া করো। আর কৈবর্তরা ভীমের আহ্বানে প্রত্যেকে ভীমবাহু সৈন্যতে রূপান্তরিত হয়। দেশপ্রেমের মন্ত্রে তারা দীক্ষিত। প্রাণের চেয়ে কৈবর্তদের কাছে স্বাধীনতার মর্যাদা অনেক বড়। তুমি যেভাবেই চেষ্টা করো না কেন—এভাবে তুমি ভীমকে হারাতে পারবে না।'

রামপাল জিজ্ঞেস করলেন, 'ভীম এত জনপ্রিয়তা পেল কী করে? ডাক দিল বলেই প্রাণসংহারী যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ল কৈবর্তরা? ভীমের কাছে কী এমন মন্ত্র আছে?'

মথনদেব বললেন, 'ভীমের হাতে আছে এক সঞ্জীবনী মন্ত্র। এ মন্ত্র অবশ্য ভীমের নিজের নয়, দিব্যোকের কাছ থেকে পাওয়া।' রহস্যে ঘেরা মথনদেবের কণ্ঠস্বর।

'কী সেটা, মাতুল, রহস্যাবৃত উত্তর না দিয়ে সব খুলেমেলে বলুন।'

'প্রজারঞ্জনী মন্ত্র। দিব্যোক সামন্ত থেকে রাজা হওয়ার পর প্রজাকল্যাণে নিজেকে পরিপূর্ণভাবে সঁপে দিয়েছিল। ভীম দিব্যোকের প্রচলিত প্রজাকল্যাণ অব্যাহত রেখেছে। শুনেছি, ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি আর অসহায়দের সে অকাতরে দান করে, যেটা তোমার দাদা করত না। গ্রামে গ্রামে মন্দির তৈরি করে, শিবমন্দির। দিব্যোক শিবকে বড় শ্রদ্ধা করত। রাজার দেবতা মানে প্রজার দেবতা। দিব্যোক থেকে ভীম পর্যন্ত সব প্রজা ধীরে ধীরে শৈব হয়ে গেল। জলাশয় খনন আর সড়ক নির্মাণ ভীমের শাসনকাল অব্যাহত রেখেছে। আজ ভীমের সুশাসনে হালিক-জালিকরা, মাঝি-মাল্লারা, তন্তুবায়-কর্মকাররা, কাংস্যকার-সূত্রধররা বরেন্দ্রভূমিতে অসীম সুখে জীবন যাপন করছে। এখন তুমিই বলো, যে রাজা প্রজাসুখ নিশ্চিত করে, তার জন্য প্রজারা জান বাজি ধরবে কি না?'

রামপাল বললেন, 'মাতুল, আপনি এতক্ষণ আমাকে যা কিছু বললেন, তার সবটুকুর মধ্যে দিব্যোক আর ভীমের প্রশংসাই উচ্চারিত হয়েছে। আপনি চান না মাতুল, ভীম পরাজিত হোক, কৈবর্তশাসন রসাতলে যাক?'

'কিন্তু আমি তোমাকে যা বলেছি, তা বাস্তবতা। শকুনিমামা নয়, প্রকৃত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মামার দায়িত্বই পালন করেছি আমি। বাস্তবতা না জেনে যুদ্ধাভিযান করলে তোমার পরাজয় অনিবার্য। এখন তুমি বাস্তবতার ভূমিতে দাঁড়িয়ে সুষ্ঠু পরিকল্পনা করে এগোবে। আমার তথ্যগুলো তোমাকে বাস্তব সচেতন করে তুলবে।'

অনেকক্ষণ ধরে কথা বলছেন মথনদেব। একটু যেন হাঁপিয়ে উঠলেন। ঠান্ডা জল খেতে ইচ্ছে করলেন তিনি। রামপাল ঘন্টিতে হাত দিলেন। প্রহরী এলে ঠান্ডা জল আনার আদেশ দিলেন। ঠান্ডা জল এলে একচুমুকেই শেষ করলেন মথনদেব। বললেন, 'সুশীতল জলের সঙ্গে গাছপাকা বেল আর শর্করা মেশানো হয়েছে। পান করে বড় তৃপ্তি পেলাম ভাগিনেয়।' তারপর সরাসরি রামপালের চোখে চোখ রেখে বললেন, 'তুমি জিজ্ঞেস করেছ, আমি ভীমের পরাজয় চাই কি না? অবশ্যই চাই, একবার নয়, হাজারবার চাই। দেখো রামপাল, ওই সমৃদ্ধ কৈবর্তভূমিতে আবার গোপালের বংশধরদের অধিকার প্রতিষ্ঠা পাক, এটা আমি মনেপ্রাণে চাই। আমি একান্ত মনে এটাও চাই যে ঐশ্বর্যময় ডমরনগরের ভীমের রাজপ্রাসাদের সর্বোচ্চ চূড়ায় রামপালের পতাকা পতপত করে উড়ুক। কিন্তু ভাগিনেয়, ধীরে, খুব ধীরে পরিকল্পনা করে এবারের যুদ্ধাভিযান করো। যুদ্ধজয়ের পর ডমরনগর লুণ্ঠন করো না, ধ্বংস করো না। শুনেছি, পরিকল্পিত নগর নির্মাণ করেছে দিব্যোক আর ভীম। বড় সুন্দর কারুকাজ, চোখ-ঝলসানো স্থাপত্য।'

রামপাল হঠাৎ হো হো করে হেসে উঠলেন, 'মাতুল, আপনি যেভাবে বলছেন অচিরেই যেন ডমরনগর আমার পদানত হবে!'

'কৈবর্তরাজ্য জয় করা তোমার জন্য একটু কষ্টসাধ্য হবে ঠিক, তবে আমার মন বলছে, জয় তুমি পাবেই।'

'ওটা আপনার স্বপ্নের কথা। ভালোবাসার স্বপ্ন। আপনি আমাকে ভালোবাসেন বলে আমার মঙ্গল আর সুখ চান। ওই মঙ্গলচিন্তা থেকে আপনি বলছেন, পালদের হাতে ভীম পরাজিত হবে। কিন্তু সেটা যে সহজ নয় আমি জানি, বড় কঠিন কাজ ভীমকে পরাজিত করা।' গভীর দুশ্চিন্তা ছড়িয়ে আছে রামপালের চোখেমুখে।

'কেন বড় কঠিন কাজ? তুমি তো তোমার অনুগত সামন্তদের সঙ্গে কথা বলেছ, সাহায্য চেয়েছ। তারা কি তোমাকে আশ্বস্ত করেনি,' জিজ্ঞেস করলেন মথনদেব।

এবার একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করলেন রামপাল। হতাশ সুরে বললেন, 'কার কাছে যাইনি, মাতুল! কৌশাম্বির রাজা দ্বোরপবর্ধন, পীঠ ও মগধের রাজা ভীমযশ, পদুবম্বার সামন্ত সোম, দণ্ডভুক্তির নৃপতি জয়সিংহ, কুজবটির রাজা শূরপাল, তৈলকম্প অধিপতি রুদ্রশিখর, উচ্ছাল নৃপতি ভাস্কর সিংহ, কজঙ্গল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মণ্ডলের নরসিংহার্জুন, সংকট গ্রামের চণ্ডার্জুন, ঢেক্করীয় রাজ প্রতাপ সিংহ, নিদ্রাবলীর বিজয়রাজ—কার কাছে আমি যাইনি, মাতুল! সবার কাছে গেছি। নামে আমি পালসম্রাট। পালসম্রাট হয়ে পালরাজাধীন এসব সামন্তের দ্বারে দ্বারে গিয়েছি আমি।'

মথনদেব আগ্রহভরে জিজ্ঞেস করলেন, 'নিশ্চয়ই তারা তোমাকে ভরসা দিয়েছে। যুদ্ধে অস্ত্র, সৈন্য ও অর্থ সরবরাহের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।'

'আনুগত্য শব্দটি তারা ভুলে গেছে। কেন্দ্রের দুর্বলতার সংবাদ তারা রাখে। তাই তাদের আচরণে তেমন সৌজন্য আমি দেখিনি।' দুঃখিত কণ্ঠ রামপালের।

মথনদেব বিস্মিত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন, 'মানে! তাহলে তারা কি তোমাকে ফিরিয়ে দিয়েছে?'

'না, ফিরিয়ে দেয়নি। তবে...।'

'তবে কী?'

রামপাল বললেন, 'মাতুল, আপনি তো জানেন, এই যে রণহস্তী, অশ্বারোহী, পদাতিক আর নৌসেনার সমারোহ, এ সবকিছু আমাকে কিনতে হয়েছে। ঠিক এসবের মতো করেই আমাকে সামন্তদের কাছ থেকে যুদ্ধকালীন মৈত্রীকেও কিনতে হয়েছে। প্রচুর অর্থ, প্রচুর ভূমির বিনিময়ে তারা সহযোগিতার হাত বাড়াবে বলেছে আমার দিকে। শুধু এটা নয়, যুদ্ধজয়ের পর বরেন্দ্রভূমি লুণ্ঠনের অধিকারও তাদের দিতে হয়েছে আমাকে। কেমন দুর্ভাগা আমি দেখুন, মাতুল! আমার বাবাকে আপনি দুর্ভাগা বলেছেন, কিন্তু প্রকৃত দুর্ভাগা তো আমি, এই রামপাল।'

'হতাশ হয়ো না, রামপাল। অঙ্গ, উত্তর রাঢ়া, দক্ষিণ রাঢ়ার সামন্ত ছাড়া আর কোথায় যাওয়ার আছে তোমার! বরেন্দ্রি একা হলেও তৌলদণ্ডের বিচারে কিন্তু তার পাল্লা ভারী। কারণ, জনগণ ভীমের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করেছে,' মথনদেব বললেন।

'তার পরও আমাকে এ যুদ্ধে জয়লাভ করতে হবে, ভীমের মস্তক ধুলায় লুটাতে হবে, কৈবর্ত-নারীদের দলে দলে দাসীতে রূপান্তরিত করতে হবে। কৈবর্তদের নাম বরেন্দ্রি থেকে যেদিন আমি সর্বাংশে মুছে দিতে পারব, সেদিনই আমার পরম তৃপ্তি, চরম সুখ।'

'তোমার মনস্কামনা পূরণ হোক—এই আশীর্বাদ করি আমি তোমাকে।' নিমীলিত চোখে মথনদেব বললেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আট

দ্বিতীয় মহীপাল থেকে রামপাল পর্যন্ত, দিব্যোক থেকে ভীম পর্যন্ত পাল আর কৈবর্তদের মধ্যে অনেকবার আক্রমণ প্রতি-আক্রমণ হয়েছে। মহীপাল দিব্যোকের হাতে নিহত হওয়ার পর পালদের রক্তে নাচন লেগেছে, কৈবর্তধ্বংসের নাচন। মহীপাল, শূরপাল, রামপাল—প্রত্যেকে চেয়েছেন এই বরেন্দ্রভূমি থেকে কৈবর্ত বংশ ধ্বংস হোক, নিশ্চিহ্ন হোক কৈবর্তশাসন। কিন্তু পাল বংশের এই তিনজন শাসক পরিকল্পনা আর বিচক্ষণতার অভাবে বারবার পরাজিত হয়েছে কৈবর্তদের হাতে। এই কিছুদিন আগেও রামপাল ভীমের বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিযান করেছেন, কিন্তু ভীমসৈন্যের হাতে পর্যুদস্ত হয়ে পিছু হটতে বাধ্য হয়েছে পাল সৈন্যদল। প্রচণ্ড গ্লানি আর হতাশায় ভেঙে পড়েছিলেন রামপাল। কিন্তু বাগ্মী ও বিচক্ষণ মথনদেবের পরামর্শে রামপাল সামন্তদের দ্বারে দ্বারে গিয়ে সাহায্য প্রার্থনা করেছেন। ধনরত্ন লাভ, যথেচ্ছা কর বাড়ানোর অধিকার, কৈবর্তরাজ্য লুণ্ঠনের অধিকার পাওয়ার প্রতিশ্রুতিতে সামন্তরা ঐক্যবদ্ধ হলো। সামন্তদের জোট বাঁধার আরও একটি কারণ আছে। ভীম পরাজিত হোক—এটা সবাই চাইছিল। ভীমের পরাক্রম সবাইকে বিদ্ধ করছিল। রাজ্য শাসন করবে ক্ষত্রিয় অথবা বৌদ্ধ, কৈবর্ত নয়। একটা হীন জাতি, যাদের অবস্থান পাদুকার তলদেশে, তাদের মাথার ওপর রাজচ্ছত্র! সব মানা যায়, এটা কিছুতেই মানা যায় না। দিব্যোক যতই আদর্শ রাজা হোক, ভীম যতই প্রজাদের সুখে রাখুক, তাতে কিচ্ছু যায়-আসে না সামন্তদের। ওদের একমাত্র কামনা—ভীমকে মানে কৈবর্তধারাকে স্তব্ধ করে দিতে হবে চিরতরে। সোনার বরেন্দ্রিকে শ্মশানে পরিণত করতে হবে।

তবে ভীমকে হেলাফেলা করলে ভুল হবে। এ ভুল বার কয়েক রামপাল করেছেন; মহীপাল করেছেন মহাভুল। সেই মহাভুলের খেসারত দিতে হচ্ছে রামপালকে। এবার সর্বশক্তির সমন্বয়ে যুদ্ধাভিযান হবে। পুণ্ড্রবর্ধন, কোটিবর্ষ, পঞ্চনগর, সোমপুর সমৃদ্ধ নগর। এগুলোর পাশাপাশি ডমরনগর দাঁড়িয়ে আছে সকল ঐশ্বর্য বুকে ধারণ করে। এ নগর শুধু ঐশ্বর্যময় নয়, সামরিক শক্তিতে দুর্ভেদ্যও। এহেন কৈবর্তনগরকে করতলগত করতে চাইলে সীমান্তে আর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নদীপাড়ে সৈন্যসমাবেশ করতে হবে। তৈরি করতে হবে স্কন্ধ। রামপালের আদেশে পুরাতন স্কন্ধগুলো মেরামত করা হচ্ছে, আর তৈরি করা হচ্ছে শত শত নতুন দুর্ভেদ্য স্কন্ধ।

বরেন্দ্রি সূর্য ভীম এসব সংবাদ রাখেন। তাঁর আছে বিশ্বস্ত গুপ্তচর বাহিনী। এরা ভীমের কাছে সংবাদ পৌঁছায়—রামপাল-মথনদেবের মন্ত্রণার কথা, চৌদ্দ জন সামন্তকে প্রলুব্ধ করে একজোট করার সংবাদ, বড় ধরনের যুদ্ধাভিযানের জন্য শত শত স্কন্ধ পুনর্নির্মাণ ও নির্মাণ করার খবর। বিশাল সৈন্যবাহিনী গঠনে যে রামপাল তৎপর হয়ে উঠেছেন, এ সংবাদও গুপ্তচরেরা মহারাজ ভীমের কাছে নিয়ে আসে। ভীমও হাত গুটিয়ে বসে নেই। তাঁর তো নিয়মিত সৈন্যবাহিনী আছেই, আর আছে দেশপ্রেমী জনগণ। তাঁর আহ্বানে কৈবর্ত-পুলিন্দ-নিষাদ সমবেত হচ্ছে। তন্তুবায়, স্বর্ণকার, তৈলকার, ডোম, চাষি, হালিক-জালিক, কবি, মাঝি একত্র হচ্ছে। কেন একত্র হবে না? ভীম যে তাদের রাজা, বরেন্দ্রির সূর্য। 'মোরাদের রাজা' ভীমের পরাজয় কিছুতেই মেনে নেবে না এরা। ভীমের পরাজয় মানে তো তাদের ধ্বংস। ভীমের মৃত্যু হলে তারা কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে? তাদের দাঁড়ানোর জায়গাগুলো, জীবন-জীবিকার ক্ষেত্রগুলো ধ্বংস করে দেবে পালরা। তাদের দেশছাড়া করবে, হাজারে হাজারে হত্যা করবে। তাদেরই সামনে তাদের মা-বোন, স্ত্রী-কন্যাকে বলাৎকার করবে, ক্রীতদাসীর মতো নিজেদের ঘরে নিয়ে যাবে। পরিচারিকার কাজ করাবে আর যখন মন চাইবে শয্যাসঙ্গিনী করবে। কিছুতেই তা হতে দেবে না বরেন্দ্রিবাসী, দেহের শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে ভীমের হয়ে যুদ্ধ করে যাবে তারা।

আর ভীমের জন্য যুদ্ধ করবেই না কেন তারা? প্রজাকুলের মঙ্গলের জন্য কী না করেছেন ভীম! দেশের নানা স্থানে বড় বড় জলাশয় খনন করেছেন, যোজন যোজন বৃক্ষাচ্ছাদিত পথ তৈরি করেছেন, দস্যু-আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য সুউচ্চ প্রাকার নির্মাণ করেছেন, আর বারে বারে পাল আক্রমণ প্রতিহত করে শিয়াল-কুকুরের মতো সীমান্তের ওপারে পাল সৈন্যদের বিতাড়িত করেছেন।

বরেন্দ্রি সূর্যের ডাকে আজ বরেন্দ্রিবাসী এককাট্টা হয়েছে। নানা বৃত্তির মানুষ জড়ো হচ্ছে ডমরনগরে। যার যার হাতের কাছে যে অস্ত্র আছে, তা-ই নিয়ে কৈবর্তরাজের সৈন্যবাহিনীতে যোগদান করছে তারা।

বিপুল যুদ্ধাস্ত্র সংগ্রহ করতে শুরু করেছেন ভীম। কালিন্দী-লৌহিত্য-মহানন্দা-করতোয়া-পুনর্ভবা-আত্রাই নদীর পাড়ে নৌঘাঁটি তৈরি হতে থাকল। হাজারে হাজারে দ্রুতগামী যুদ্ধনৌকা এসব গোপন ঘাঁটিতে জড়ো করতে লাগলেন ভীম। সহস্র সহস্র নৌসেনা সমবেত হতে থাকল এসব নৌঘাঁটিতে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খাণ্ডবদাহের আগুন ভীমের মনে। বরেন্দ্রির সূর্য দিব্যোককে, রুদককে স্বস্তিতে রাজত্ব করতে দেয়নি এই পালরা, এবার তাদের রেহাই নেই। বরেন্দ্রির গ্রামে গ্রামে আগুন দিয়েছে যারা, তাদের বেঁচে থাকার অধিকার নেই। কৈবর্ত-কর্মকার-নাপিত-কুম্ভকার-ধোপা-তৈলকার-ডোম নারীদের বারে বারে শ্লীলতা হরণ করেছে যারা, তাদের রক্তে এই পবিত্র ভূমিকে স্নান করাতে হবে।

বারংবার মন্ত্রণাসভায় বসেন ভীম। সেই সভায় উপস্থিত থাকেন মহাসমরনায়ক কঙ্কণ, গুপ্তচরপ্রধান কৃপাসিন্ধু, অর্থমন্ত্রী বিশ্বমঙ্গল আর শর্বদেব। আরও একজনের উপস্থিত থাকার কথা এই গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণাসভায়, সে চণ্ডক। চণ্ডকের বয়স কম হলেও অত্যন্ত দক্ষ সমরনায়ক সে। মহারাজের ভীষণ আস্থাভাজন। চণ্ডক কাছে থাকলে মনে ভরসা আর দেহে জোর পান ভীম। যুদ্ধকালীন এই সময়ে চণ্ডককে বড় দরকার ভীমের। কিন্তু রাজাকে সময় দেওয়ার মতো সময় এখন চণ্ডকের হাতে নেই। চণ্ডকের পুরো সময় এখন মোহনার জন্য বরাদ্দ। ভীম সংবাদ পাঠান চণ্ডককে, 'মন্ত্রণাসভায় তোমার উপস্থিতি জরুরি, আগামী সভায় উপস্থিত থাকবে।' ভীমের আহ্বানে চণ্ডক আসে, কিন্তু আগের চণ্ডক আসে না। সে রকম যেন অন্যমনস্ক। যুদ্ধ পরিকল্পনায়, সৈন্যসমাবেশের কায়দা বিষয়ে, গুপ্তচরদের সংবাদ সংগ্রহের কৌশল পরিবর্তনে চণ্ডক চমকপ্রদ আর কার্যকর দিকনির্দেশনা দিত। কিন্তু এখন, এই সংকটমুহূর্তে চণ্ডক নীরব এবং অন্যমনা।

আগে পালরাজ্য আক্রমণ করা উচিত, না পাল রাজার আক্রমণের পর প্রত্যাঘাত করা উচিত—এ নিয়ে মন্ত্রণাসভায় কথা হচ্ছিল। কথোপকথন থেকে বোঝা যায়, এ বিষয়ে আগের সভায় আলোচনার সূত্রপাত হয়েছে। পূর্বের সভাতেই কঙ্কণ, বিশ্বমঙ্গল আর শর্বদেব পালরাজ্য আক্রমণের পক্ষে সমর্থন দিয়েছেন। একমাত্র গুপ্তচরপ্রধান কৃপাসিন্ধু বলেছেন, 'আমি আগে আক্রমণের পক্ষে নই, মহারাজ। নিজ দেশের মাটিতে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করার একটা সুবিধা আছে। দেশের পথঘাট-নদীপথ-জলহাওয়া—এসব আমাদের সৈন্যদের জানা। নিজের মাটিতে মনের জোর থাকে। মনের জোর নিয়ে পরিচিত ভূমিতে দাঁড়িয়ে পাল সৈন্যদের পর্যুদস্ত করা আমাদের সৈন্যদের জন্য সহজ হবে। তা ছাড়া আমাদের যুদ্ধ-প্রস্তুতি এখনো সম্পন্ন হয়নি।'

কৃপাসিন্ধুর কথা শেষ হতে না হতেই মহাসমরনায়ক উষ্ণ কণ্ঠে বলে উঠলেন, 'কে বলেছে আমাদের প্রস্তুতি এখনো সম্পন্ন হয়নি? সামান্য অপূর্ণতা আছে সত্যি, তবে সেই অপূর্ণতা নিয়ে যুদ্ধাভিযান করা যাবে না—এটা সঠিক নয়। আর...।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আর গুপ্তচরপ্রধানের ওই মন্ত্রণাটিও ঠিক নয়। কে বলেছে কৈবর্ত-সেনারা পালরাজ্যে গিয়ে যুদ্ধ করলে তেমন সুবিধা করতে পারবে না? অবশ্যই পারবে, সৈন্যবাহিনীর ওপর আমার গভীর আস্থা আছে।' সেনাপ্রধান কঙ্কণের কথা শেষ হওয়ার আগে শর্বদেব বলে উঠল।

কৃপাসিন্ধু শান্ত স্বরে বললেন, 'মহারাজকে আমি অসত্য পরামর্শ দিচ্ছি না। মহারাজ এটা ভালো করেই জানেন। কৈবর্তবংশের যুদ্ধাভিযানের ইতিহাস ঘাঁটলে কিন্তু আমার কথার সত্যতা খুঁজে পাওয়া যাবে। বরেন্দ্রি সূর্য দিব্যোককে আক্রমণ করে মহীপাল নিহত হয়েছে, রুদক আর মহারাজ ভীমের সময়ে কৈবর্তরাজ্য আক্রমণ করে রামপাল বারবার পরাজয়ের গ্লানি নিয়ে নিজ দেশে ফিরে গেছে। তাই বলছিলাম—আগে আক্রমণ নয়, ওরা আক্রমণ করলে প্রত্যাঘাত করব আমরা।'

অর্থমন্ত্রী বিল্বমঙ্গল কী যেন একটা বলতে চাইলেন। ভীম ডান হাত তুলে তাঁকে থামিয়ে দিলেন। তারপর গম্ভীর হয়ে কী যেন ভাবলেন বেশ কিছুক্ষণ। তারপর অনুচ্চ কণ্ঠে বললেন, 'এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত দেওয়া থেকে আজ বিরত থাকলাম। কাল রাতে আবার মন্ত্রণাসভা বসবে। চণ্ডকের কাছে সংবাদ পাঠিয়েছি। ওর মতামতটা জানা দরকার।'

শর্বদেবের মাথা গরম হয়ে উঠল। ভেতরের উষ্মাকে সে আর দমন করে রাখতে পারল না। বলল, 'ও কী মতামত দেবে? মহাসমরনায়ক, অর্থমন্ত্রী এঁরা বিজ্ঞজন। এঁদের পরামর্শকে আপনার অগ্রাহ্য করা উচিত নয়, বাবা।'

'আমি এদের পরামর্শ অগ্রাহ্য করছি না। এ ব্যাপারে চণ্ডকের মতটা জানতে চাইছি। কাল পর্যন্ত সভা স্থগিত থাকল।' বলে মহারাজ ভীম নীরব হলেন।

শর্বদেব ভীমের কথার প্রতিবাদ করল না বটে, তবে তার চোখমুখ দেখে মনে হলো চণ্ডকের প্রসঙ্গে সে বিরক্ত। অর্থমন্ত্রী, মহাসমরনায়ক আর শর্বদেব কক্ষ থেকে বেরিয়ে গেলেন।

ভীম কৃপাসিন্ধুকে বললেন, 'আগামীকালের সভায় চণ্ডক যাতে অবশ্যই উপস্থিত থাকে, সে ব্যবস্থা করো, কৃপাসিন্ধু।'

কৃপাসিন্ধুর মাধ্যমে ভীমের সংবাদ পেয়ে আজ চণ্ডক উপস্থিত হয়েছে মন্ত্রণাসভায়। মহারাজকে মাঝখানে রেখে অর্ধচন্দ্রাকৃতিতে বসেছেন সবাই।

ভীম চণ্ডকের কাছে জানতে চাইলেন, আগে পালরাজ্য আক্রমণ, না পাল-আক্রমণের পর প্রত্যাঘাত?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অন্যমনস্ক চণ্ডক ভীমের প্রশ্নটি খেয়াল করল না। উদাসীন চোখে মন্ত্রণাসভাকক্ষের বাতায়ন দিয়ে সে বাইরের দিকে তাকিয়ে আছে। বাইরে তখন ফুটফুটে জোছনা।

'আমি তোমার কাছে জানতে চাইছি, চণ্ডক!' রাগ মেশানো উচ্চকণ্ঠ ভীমের। এবার চণ্ডকের সংবিৎ ফেরে। সচকিত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করে, 'ক্ষমা করবেন, মহারাজ, আমি আপনার প্রশ্নটি খেয়াল করিনি। কী যেন জানতে চাইছেন আমার কাছে?'

'তার আগে তুমি বলো, তোমার অন্যমনস্কতার কারণ কী? তুমি কি কোনো গভীর সংকটে পতিত হয়েছ? আমার সামনে আজকের যে চণ্ডক, সে পূর্বের চণ্ডক নয়,' মহারাজ ভীম বললেন।

লজ্জিত কণ্ঠে চণ্ডক জিজ্ঞেস করলেন, 'কী প্রশ্ন ছিল যেন, মহারাজ?'

ভীম প্রশ্নটি পুনরায় জিজ্ঞেস করার আগে শর্বদেব ব্যঙ্গের সুরে বলে উঠল, 'ও কী পরামর্শ দেবে! রাজকার্য, যুদ্ধ—এসব তো এখন ওর কাছে অসার। ও তো এখন সারের পেছনে ধাবমান।'

'তুমি কি আমাকে উপহাস করছ, শর্ব?' চণ্ডক বলল।

'না, উপহাস না, সত্য কথা বলছি। তুমি যে এখন ঘর নয়, বাহির নিয়ে মগ্ন—সে কথাটি বলতে চাইছি।'

'তোমার কথার মাহাত্ম্য?'

'তুমি এখন সংসার-সমুদ্র মন্থ, সমুদ্র মোহনা নিয়ে ব্যস্ত।' উপহাসের হাসি শর্বের মুখে।

অর্থমন্ত্রী বিল্বমঙ্গল আর মহাসমরনায়ক কঙ্কণের চোখেমুখে উসকানির প্রশ্রয়।

এবার চণ্ডক শর্বদেবের কথার মাহাত্ম্য বুঝতে পারল। শর্বদেব মোহনাকে নিয়েই উপহাস করছে তাহলে! আরে বেটা, মোহনাকে নিয়ে মগ্ন থাকব না তো কী করব! মজা তো লুটছিস বেটা তুই সকাল-সন্ধ্যা। রূপসী বউকে নিয়ে নিত্য লুটোপুটি করছিস। আমি! আমি কী করব? চোখের সামনে তুই ভোগ করবি, আর আমি হাঁদারামের মতো শুধু দেখে যাব? রীতি অনুসারে মহারাজ ভীম বিয়ে করালে এই বিয়ে তো আমারই হওয়ার কথা। তা তো হয়নি। তাই মোহনার কাছে যাই আমি। আরও যাব, আবার যাব, বারবার যাব।

চণ্ডক ধুরন্ধর। সে শর্বের উপহাসের কোনো জবাব দিল না। মনের ক্রোধকে মনেই চেপে রাখল। মুখে প্রশান্ত হাসি ছড়িয়ে চণ্ডক ভীমকে পুনরায় জিজ্ঞেস করল, 'আমার অন্যমনস্কতাকে ক্ষমা করবেন, মহারাজ। আবার কি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দয়া করে প্রশ্নটা করবেন!'

চণ্ডকের বিগলিত ভাব দেখে মহারাজ ভীমের মন নরম হয়ে এল। শর্বদেবকে চোখের ইশারায় চুপ থাকতে বলে ভীম বললেন, 'তুমি তো অবগত আছ, রামপাল যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছে। সে নাকি প্রতিজ্ঞা করেছে, কৈবর্তভূমি এই বরেন্দ্রিকে শ্মশানে পরিণত করবে। আমরাও বসে নেই। জনগণ তাদের সর্বশক্তি নিয়ে আমাদের নিয়মিত বাহিনীর পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। আমাদের নৌবাহিনী, আমাদের পদাতিক বাহিনী, অশ্বারোহী আর হস্তী আরোহী সৈন্যরা সর্বাত্মক প্রস্তুতি নিয়েছে। আজকে এই মন্ত্রণাসভায় সিদ্ধান্ত হবে—আগে আমরা আক্রমণ করব, না পাল-আক্রমণের পরে প্রত্যাঘাত করব। এ সভায় যাঁরা উপস্থিত আছেন, তাঁরা সবাই তাঁদের মতামত জানিয়েছেন। আমি তোমার অভিমত জানতে চাই।' একটানা অনেকক্ষণ কথা বলে থামলেন ভীম।

চণ্ডক ত্বরিত উত্তর দিল, 'আমি আক্রমণের পক্ষে নই, প্রত্যাঘাতের পক্ষে। প্রত্যাঘাতেই বেশি সুবিধা পাবে আমাদের সৈন্যরা।'

চণ্ডকের কথা শুনে গুপ্তচরপ্রধান কৃপাসিন্ধুর চোখেমুখে তৃপ্তির একটা আভা ছড়িয়ে পড়ল। বিল্বমঙ্গল আর কঙ্কণদেব অস্বস্তিবোধ করলেও অবয়বে তা প্রকাশ করলেন না। ভীমের অভিপ্রায় জানার জন্য তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকলেন।

ভীম কোনো ভূমিকা ছাড়াই নিজ সিদ্ধান্ত জানালেন, 'আমরা আক্রমণ করব না, প্রতি-আক্রমণ করব। সব প্রস্তুতি নিয়ে পাল-আক্রমণের জন্য অপেক্ষা করব। তারপর ধূলিসাৎ করব পালদের।'

মন্ত্রণাসভায় শ্মশানের নিস্তব্ধতা। বিল্বমঙ্গল, কঙ্কণদেব, কৃপাসিন্ধু জানেন—মন্ত্রণাসভায় কারও মত গ্রাহ্য হয়, আবার কারও পরামর্শ অগ্রাহ্য হয়। এটাই নিয়ম। রাজার অধিকার আছে শেষ সিদ্ধান্ত দেওয়ার। ভীমের সিদ্ধান্তই শেষ সিদ্ধান্ত। বরেন্দ্রি সূর্যের সিদ্ধান্তের ওপর কথা বলা ধৃষ্টতারই নামান্তর। তাই তাঁরা নিশ্চুপ থাকলেন। তাঁরা বয়স্ক এবং জ্ঞানবান। তাঁরা শক্তির চেয়ে বুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত হন বেশি। কিন্তু শর্বদেবের বয়স কম, অস্থির। সমরকৌশল বিষয়ে যথার্থ জ্ঞানার্জন তার এখনো হয়ে ওঠেনি। কৃপাসিন্ধুর গত দিনের সব পরামর্শ তার মাথা দিয়ে ঢোকেনি। ভূগোল-ইতিহাসের কথা কপচে গেছেন কৃপাসিন্ধু। আক্রমণ আক্রমণই। শক্তিশালী সৈন্যবাহিনী থাকলে নদী-নালা, পাহাড়-উপত্যকার হিসাব কষার দরকার কী? শক্তি দিয়েই তো জয় আসে, আক্রমণের ব্যাপারে এসব ভৌগোলিক বিবরণ তো অবান্তর। আর মহারাজা দিব্যোক বা রুদক প্রত্যাক্রমণে জয়লাভ করেছেন বলে প্রায় অর্ধশতাব্দী পূর্বের সেই ইতিহাসকে পটভূমিতে রেখে আজকের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যুদ্ধকৌশল ঠিক করলে বোকামিই তো হবে! সে সময়ের কৈবর্ত-সেনাশক্তিকে আজকের সেনাশক্তির সঙ্গে তুলনা করা মোটেই উচিত নয়। বর্তমানের সেনাশক্তি দুর্ধর্ষ, প্রচণ্ড। পিতার মাথায় কি গোলমাল হয়ে গেল? বরেন্দ্রি সূর্য দুর্দমনীয় ভীম কি ভয় পেয়ে গেলেন? পালশক্তিকে কৈবর্তশক্তির চেয়েও কি বেশি প্রবল এবং অপরিমেয় মনে করছেন তিনি? নইলে কেন তিনি আক্রমণ থেকে পিছিয়ে এলেন? দু-দুজন অভিজ্ঞ পরামর্শক তাঁকে যুক্তিগ্রাহ্য পরামর্শ দিলেন। তা তিনি অগ্রাহ্য করলেন। মহাসমরনায়ক কঙ্কণের শরীরে কত কত যুদ্ধের শোণিত লেগে আছে, কত শত সৈন্য তাঁর তরবারির আঘাতে নিহত হয়েছে! শত যুদ্ধের অভিজ্ঞতা তাঁর মস্তকে। সেই অভিজ্ঞতার আলোকেই তো তিনি পিতাকে যুদ্ধাভিযানের পরামর্শ দিয়েছেন; কিন্তু তা তিনি শুনলেন না। বিল্বমঙ্গল, অর্থমন্ত্রী, যিনি কঙ্কণদেবেরই সমবয়সী, তিনি তাঁর দীর্ঘদিনের জীবনাভিজ্ঞতার আলোকে পরামর্শ দিয়েছেন, তা-ও পিতা কালিন্দীজলে ভাসিয়ে দিলেন। গ্রহণ করলেন কার পরামর্শ? কৃপাসিন্ধু, সামান্য সংবাদ সরবরাহকারী মাত্র, তাঁর কথাকে মূল্য দিলেন পিতা। আর যুদ্ধকৌশলের শেষ সিদ্ধান্ত দিলেন ওই রাস্তা থেকে কুড়িয়ে আনা গণিকাসেবী চণ্ডকের পরামর্শে! আমাকে তিনি মোটেই আমল দিলেন না। কেন দেবেন না? আমার বয়স আর চণ্ডকের বয়সের মধ্যে পার্থক্যই বা কত বছরের? ওর যতটুকু যুদ্ধাভিজ্ঞতা, আমারও ততটুকু যুদ্ধাভিজ্ঞতা। তা ছাড়া মহারাজ ভীম আমার পিতা, আর চণ্ডক তো জারজ সন্তান। চণ্ডকের পরামর্শে ভীমের চরম সিদ্ধান্ত নেওয়া মোটেই উচিত হয়নি। ভাবতে ভাবতে শর্বদেবের মাথা উষ্ণ হয়ে উঠল। দেহে এবং মনে এক প্রবল ঘৃণা অনুভব করতে লাগল শর্বদেব। একটা সময়ে নিজেকে আর ধরে রাখতে পারল না শর্ব। গলা উঁচিয়ে বলল, 'আপনার এ সিদ্ধান্ত সঠিক নয়, পিতা। দুজন বিজ্ঞ মানুষের পরামর্শকে অবহেলা দেখিয়ে ওই সামান্য চণ্ডকের কুপরামর্শকে আপনি মর্যাদা দিলেন! আমার কথা না হয় বাদই দিলাম।'

শর্বদেবের উষ্ণ কণ্ঠে সবাই চমকে তার দিকে তাকালেন। নিস্তব্ধ-নির্বাক তাঁরা। স্তম্ভিতও। এ কী বলছে শর্ব! কার সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করছে! উন্মাদ হয়ে গেল না তো শর্ব! ভীম বরেন্দ্রির সূর্য। বরেন্দ্রির প্রথম সূর্য দিব্যোক। সাতাশ বছরের রাজত্ব ছিল তাঁর। এর অধিকাংশ সময়ই তিনি ব্যয় করেছেন যুদ্ধবিগ্রহে। রাজকোষের বেশির ভাগ অর্থই ব্যয় করতে হয়েছে সমরাস্ত্র ক্রয়ে এবং সৈন্যদের বেতন-ভাতাদিতে। তার পরও দিব্যোক আজকের কৈবর্তভূমির অধিকাংশ সৌধ নির্মাণ, পথ তৈরি, প্রজাকল্যাণমূলক অন্যান্য কার্যের সূচনা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করেছিলেন। রুদক সময় পাননি বেশি। বর্তমান বরেন্দ্রির যত ঐশ্বর্য-জৌলুশ, যত অহংকার-দীপ্তি, যত সামরিক শক্তি, রাজকোষের সমৃদ্ধি—সবই তো ভীমের জন্যই সম্ভব হয়েছে। ভীমই তো আধুনিক বরেন্দ্রির নির্মাতা। সেই মহান নির্মাতার সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করছে তাঁরই অল্পবয়স্ক অনভিজ্ঞ আত্মজ! এটা তো নির্বুদ্ধিতার নামান্তর। একমাত্র অর্বাচীন না হলে এ রকম কাজ কেউ করতে পারে না। শর্বদেবের ধৃষ্টতায় প্রথমে সবাই জড়তাপ্রাপ্ত হলেও অল্প সময়ে কঙ্কণদেব তা কাটিয়ে উঠলেন। মহারাজ ভীমের দিকে তাকালেন কঙ্কণ। দেখলেন, ভীমের চোখ বিস্ময়ে বেরিয়ে আসতে চাইছে। কী যেন বলতে চাইছেন তিনি, কিন্তু মুখ দিয়ে বাক্য স্ফুরিত হচ্ছে না। মুহূর্তে ভীমের মনোভাব বুঝতে পারলেন মহাসমরনায়ক কঙ্কণ। দ্রুত বলে উঠলেন, 'আপনি শান্ত হোন, মহারাজ। শর্বদেবের যুদ্ধাভিজ্ঞতা নেই বললেই চলে। গতকাল আমরা আমাদের নিজস্ব মত প্রকাশ করলেও পরে বুঝেছি, গুপ্তচরপ্রধান কৃপাসিন্ধুর পরামর্শই যথার্থ। আর চণ্ডক তো কোনো নতুন কথা শোনায়নি। কৃপাসিন্ধুর গত দিনের মতকেই আজকে সে ব্যক্ত করেছে। চণ্ডক আপনাকে কুপরামর্শ দেয়নি। আর আপনি এই কৈবর্তরাজ্যের সর্বাধিকারী। আপনার সিদ্ধান্তই শেষ সিদ্ধান্ত। তার ওপর কথা বলা চলে না। শর্বদেব তরুণ, রক্ত গরম। আপনি তার কথায় অপরাধ নেবেন না, মহারাজ।'

ভীমের বিস্ময় কাটতে সময় লাগছে। তিনি কিছু বলার আগে কৃপাসিন্ধু বললেন, 'আমি বেশ কিছুদিন ধরে লক্ষ করছি, মহারাজ, চণ্ডক আর শর্বদেবের মধ্যে কী রকম যেন একটা দ্বন্দ্ব ঘূর্ণিপাক খাচ্ছে। একে অন্যকে সহ্য করতে পারছে না বলে আমি অনুমান করছি। যুদ্ধাভিযানের আগে উভয়ের দ্বন্দ্ব মিটিয়ে ফেলা উচিত বলে আমি মনে করি। যুদ্ধক্ষেত্রে ওরা দুজন আপনার দুপাশে থাকে।'

'ও আমার সুখ সহ্য করতে পারে না। আমার যুবরাজত্বে সে হিংসাতুর,' শর্বদেব রাগত কণ্ঠে বলল।

শর্বদেবের কথায় উত্তেজিত হয়ে উঠবে ভেবে সবাই চণ্ডকের মুখের দিকে তাকাল। কিন্তু সবাই দেখল, চণ্ডক নির্বিকার। করুণার চোখে সে একবার শর্বদেবের দিকে তাকাল মাত্র। তারপর প্রশান্ত চোখে তাকিয়ে থাকল ভীমের দিকে।

এর মধ্যে ভীমের ভেতরটা শান্ত হয়ে এসেছে। পোড়খাওয়া মানুষ তিনি। জানেন, মন্ত্রণাসভার উত্তেজনা ভুল সিদ্ধান্ত নিতে প্ররোচনা দেয়। নিজের ভেতর চোখ রাখলেন তিনি, নিজের বুদ্ধি-বিবেকের সঙ্গে কথা বললেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বুঝলেন, নিজে যা সিদ্ধান্ত দিয়েছেন, তা যথার্থ। শর্ব ধৃষ্টতার পরিচয় দিয়েছে, কিন্তু এ মুহূর্তে তার বিচার করতে বসলে ভুল হবে। শর্বদেবের বিচার একান্তে পারিবারিকভাবে হবে। এখানে নয়, এ মুহূর্তে নয়।

তিনি অস্বাভাবিক শান্ত কণ্ঠে বললেন, 'আমার পূর্ব ঘোষিত সিদ্ধান্তই অটল থাকবে।' বলে তিনি অধোমুখী হলেন।

উপহাস ঝিলিক দিয়ে উঠল চণ্ডকের চোখেমুখে। শর্বদেবের চোখে চোখ রেখে মনে মনে বলল, আমি তোকে দেখে নেব, শর্ব। 'সামান্য চণ্ডক' বলার প্রতিশোধ আমি নেব একদিন। আমি তো জানি, মহারাজ ভীমের পর তুই একদিন রাজা হবি। আমি তোর রাজা হওয়ার পথ দুর্গম করে তুলব, কণ্টক ছড়িয়ে দেব আমি সেই পথে।

কোনোরূপ বিদায় সম্ভাষণ না জানিয়ে ধীর পদক্ষেপে মহারাজ ভীম মন্ত্রণাসভা থেকে বেরিয়ে গেলেন।

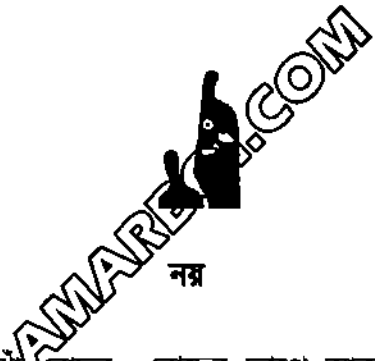
AMARBOI.COM

নয়

জ্যৈষ্ঠের দুপুর। ঝাঁ ঝাঁ রোদ্দুর। রোদের তাপে আকাশ বুঝি চৌচির হয়ে ডমরনগরের মাটিতে ভেঙে পড়বে। কালিন্দীপাড়ের গাছগাছালি এমনিতেই ডাল-পাতাবহুল। ওদের গায়ে গায়ে ঘন সবুজাভা। কালিন্দীর জল আর পলির প্রভাবেই বুঝি ও রকম হয়েছে। আজকের খরতাপে তারা ঝিমিয়ে পড়েছে। রোদে পথঘাট পুড়ে যাচ্ছে। নগরবাসী যার যার নিত্যদিনের কর্ম সম্পাদন শেষে ঘরে ফিরে গেছে। রাজপথ প্রায় জনশূন্য। মাঝেমধ্যে দু-একটা শকট নানা আওয়াজ তুলে এদিক থেকে ওদিকে, ওদিক থেকে এদিকে যাতায়াত করছে। আওয়াজ উঠছে—খ্যাঁচ-কোঁচ, খ্যাঁচ-খ্যাঁক, হইহই হট, হোহুম না হোহুম না।

বারাঙ্গনাপল্লির কিন্তু অন্য চিত্র। ঠিক দুপুরে অতিথি নেই কারও ঘরে। সকালের দিকে যে কজন অতিথি ঢুকিয়েছে, তারাও এখন গা-গতর ধুয়েমুছে ঘরোয়া পোশাকে সজ্জিত। ঘরে ঘরে দুপুরের রন্ধন শেষ হয়েছে। আহারপর্বও শেষ করেছে অনেকে। অলস ভঙ্গিতে কেউ বিছানায় শুয়ে পড়েছে, কেউ-বা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এলোচুলে দূর আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে। আগ্রহহীন চোখ তাদের—উদাসীন। কারও কারও নজর আবার ঘরের কড়িকাঠের দিকে। ওই চোখে জীবনের যোগ-বিয়োগ মেলানোর মগ্নতা।

এই ভরদুপুরে মোহনার ঘরে মোহনাকে ঘিরে বসেছে কয়েকজন। প্রৌঢ়া, বৃদ্ধা, নবীনা। জানকি, অলকা, বিশাখা, অহল্যা, কুন্তি—এরা। আর আছে বাচনি। শয্যার মধ্যিখানে খোলা চুলে বসেছে মোহনা। শয্যাপাশের চতুষ্কীতে বসেছে জানকি। জানকি এই বারাঙ্গনাপল্লির মাননীয়া, মোহনার নিকটজন। চতুষ্কীতে বসার অধিকার জানকিরই আছে। মেঝেতে বসেছে অন্যরা। অন্য একটি উঁচুমতন আসনে বাচনিকে বসানো হয়েছে। সম্মানে বাচনিও কম যায় না। এ পল্লির বামুনঠাকুরের কন্যা এই বাচনি। সামনের দিকের কয়েকটা চুলে পাক ধরেছে তার। বয়স চল্লিশ পেরিয়ে গেলেও গতরের কোথাও টোল পড়েনি। ঝকঝকে দাঁত। পরনে পাড়ওয়ালা ধবধবে সাদা শাড়ি। স্বামী মারা যাওয়ার পর এ রঙের শাড়িই পরে থাকে সে। মধুর কণ্ঠ তার, প্রতিটি শব্দে আঙুরের মিষ্টতা। বাচনি তার আসল নাম নয়। বয়োবৃদ্ধ যে কজন তার প্রকৃত নাম জানে, তারাও বহুশ্রুত বাচনি নামটিতে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। বচন থেকেই বাচনি হয়েছে। রামায়ণ, মহাভারত, গীতা, অষ্টাদশ পুরাণ, জাতকের নানা কাহিনি তার কণ্ঠস্থ। ক্লান্ত-বিষণ্ন বারাঙ্গনারা মাঝেমধ্যে বাচনিকে ডেকে আনে তাদের ঘরে। তার কাছে শুনতে চায় রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনি। বাচনির বর্ণিত কাহিনির সঙ্গে নিজেদের জীবনের সুখ-দুঃখের হিসাব মেলায় তারা। কথা শেষে বাচনি দক্ষিণা পায়, ওই দিয়ে তার জীবন চলে। শুধু এ দিয়ে জীবন চলে বললে ভুল হবে, গজনঠাকুরও এ-বাড়ি ও-বাড়ি পুজো-আচ্চা করে যা পান, তা-ও যুক্ত হয় বাচনির প্রাপ্ত দক্ষিণার সঙ্গে।

তবে আজকে মোহনার ঘরে বাচনির আগমন ভিন্ন কারণে। দীর্ঘদিন চণ্ডক মোহনার ঘরে আসছে না। মোহনার কাছে খবর আছে, চণ্ডক মন্ত্রণাসভা, যুদ্ধপ্রস্তুতি এসব নিয়ে ব্যস্ত। কিন্তু মোহনার শরীর তো রক্ত-মাংসের, কামনা-বাসনার; দেহযাতনারও। দেহযাতনায় অতিষ্ঠ মোহনার মনটা বড় চঞ্চল হয়ে উঠেছে। জানকি টের পায় সব। দুকড়ির জানকির পক্ষে চণ্ডককে বারাঙ্গনাপল্লিতে ডেকে আনা অসম্ভব। মোহনা জানকির আত্মজার চেয়েও বেশি। মোহনার মানসিক কষ্ট জানকিকে বিদ্ধ করে। তার স্বস্তির প্রয়োজন। তাই বাচনিকে ডাকা। বাচনির মধুর বচনে যদি মোহনার মধ্যে তৃপ্তির উদ্ভব হয়! বাচনিকে জানকি আগেই এ বিষয়ে একটু ইঙ্গিত দিয়ে রেখেছে।

মোহনার ওপর অপাঙ্গদৃষ্টি ফেলে 'মোরাদের' বলে জিহ্বায় কামড় খেয়ে বাচনি বলে, 'এই পল্লির মেয়েদের দেবতা হলো কন্দর্পদেব। যে কামনায় অন্ধ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হয়ে পুরুষজাতি ছুটে ছুটে আসে এই পাড়ায়, সেই কামের দেবতা ইনি। এই ত্রিভুবনে যত মানুষ আছে, সবাই তাঁর পদানত। নারী-পুরুষ কার না রতিক্রীড়া করতে ইচ্ছে করে! এঁর স্ত্রীর নাম রতি।'

মুখ আলগা বিশাখা বলে ওঠে, 'রতি মানে তো মৈথুন। নারী-পুরুষের বুকাবুকি হওয়ারে তো মৈথুন কয়।'

রাগের একটুখানি ঝিলিক বাচনির চোখে দেখা দিয়ে মিলিয়ে গেল। বলল, 'রতির আরেকটা অর্থ আছে—আসক্তি। এই পৃথিবীর সব প্রাণীর মধ্যে পারস্পরিক যে বন্ধন দেখো, তার সবটাই আসক্তির জন্য। পুরুষের মধ্যে নারীদের জন্য আসক্তি আছে। আর নারীদের মধ্যে পুরুষের জন্যও আসক্তি আছে। আসক্তি মেটানোর জন্য পুরুষেরা ছুটে আসে এই গণিকাপল্লিতে। পুরুষদের যদি এ রকম কোনো পল্লির প্রচলন থাকত, তাহলে রমণীরাও সেখানে ছুটে ছুটে যেত রমণ করার উদ্দেশ্যে।'

একটু দম নিল বাচনি। তারপর বলল, 'যা বলছিলাম—ওই কন্দর্পের কথা। মহাদেবের রোষানলে পড়ে কামদেব ভস্ম হয়ে গেলেন। দেবতারা বেদিশা হয়ে পড়লেন। আরে মৈথুনই যদি না থাকে, তবে এই জীবনের অর্থ কী? ছুটে গেলেন তাঁরা মহাদেবের কাছে। প্রার্থনা—কন্দর্পকে বাঁচিয়ে তুলুন। মহাদেবের এক কথা : "আমার তৃতীয় নেত্রের অগ্নিতে যে একবার ভস্মীভূত হয়, সে কখনো পুনরায় শরীর প্রাপ্ত হয় না।" দেবতারা নাছোড়। তা কী করে হয়? স্বর্গলোকে আর মর্ত্যে কত ক-ত সুন্দরী রমণী! কামই যদি না থাকে, তাহলে এই রূপসী ললনা, এই সুশোভন স্বর্গ-মর্ত্য—কোনো কিছুরই তো মানে থাকে না। দেবতাদের পীড়াপীড়িতে মহাদেব নিমরাজি হয়ে বললেন, "এই বর দিচ্ছি, আজ থেকে কন্দর্প অশরীরী হয়েও আগের মতো দেবতা-মানব-দানব সবার ওপরে আধিপত্য বিস্তার করতে সক্ষম হবে।" তার অর্থ হলো, মানুষের মধ্যে আগের মতো দেহাসক্তি থাকবে।'

বিশাখা আবার বলল, 'মোরা বেঁচে গেলাম গো। পুরুষজাতির মাঝে এই গুঁতোগুঁতির ভাব না থাকলে মোরাদের কী গতি হতো গো?'

বাচনি বলল, 'যৌনতাই হচ্ছে বাস্তবতা। যৌনতা ছাড়া পৃথিবী অসার। যৌনতা আছে বলে পৃথিবীর গাছপালা, নদী-সমুদ্র-পাখপাখালি—এসবকে বড় ভালো লাগে। নারী ও পুরুষ—উভয়ের মধ্যে কাম আছে। আমার বিবেচনায় উভয়ের মধ্যে এটি সমান প্রাবল্যে আছে। নারীরা রেখেঢেকে রাখে, পুরুষেরা কামের জ্বরে উন্মাতাল হয়। ওদের কামমত্ততাকে সামাল দেওয়ার জন্য এই বারাঙ্গনাপল্লির সূচনা। যুগ যুগ ধরে নানা রাজা আর রাজাধিরাজ এ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ব্যাপারটিকে প্রশ্রয় দিয়েছেন।'

'আহা রে, এই রকম যদি একটা পুরুষপল্লি থাকত! কী মজাই না হতো! সুন্দর সুন্দর পুরুষের সঙ্গে শোয়া যেত গো। দায়ে পড়ে কত বৃদ্ধ, আধবয়সী, ল্যাংড়া, কানা, কুষ্ঠগ্রস্ত, পাতলা, হোৎকার সাথে যে শুতে হয় গো মোরাদের!' দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে কুন্তি।

বাচনি বলে, 'তার পরও তো তোমাদের ভাগ্য ভালো। সবাই কড়ি ফেলে যৌবন লোটে। এমন দিনও ছিল, যাকে মনে ধরেছে, পুরুষেরা তাকে ভোগ করেছে। এই রকম পুরুষদের মধ্যে মুনিঋষিও আছেন। কড়ি তো দূরের কথা, জীবন নিয়ে টানাটানি। শরীর দিতে অস্বীকার করেছ তো অভিশাপ দেওয়ার ভয় দেখালেন।'

এতক্ষণ মৌন থাকা মোহনা এবার কথা বলে, 'বুঝলাম না মাসি, বুঝিয়ে বলো।'

বাচনি মোহনার চোখে পূর্ণ চোখ রাখে। বলে, 'সে বহু বহু যুগ আগের কথা। মহাভারতের যুগ সেটা। দাশরাজার কন্যা সত্যবতী পিতার আদেশে পুণ্যলাভের আশায় যমুনার ঘাটে লোক পারাপার করেন। তাঁর কোমল দেহে যৌবনের পূর্ণচ্ছটা। একদিন নদী পার হতে এলেন পরাশর মুনি। মাথায় জটা। তপস্যায় তপস্যায় খ্যাংড়াকাঠি হয়েছে শরীর। শরীরের চামড়া রুক্ষ। রোদে ঝলসানো চোখ। চেহারা দেখে মনে হচ্ছে—বেশ ক'বেলার উপবাসী। সত্যবতী ঘাটে নৌকা ভেড়ালে পরম গাম্ভীর্য নিয়ে নৌকায় উঠলেন পরাশর। ওপারের উদ্দেশে নৌকা ছাড়লেন সত্যবতী।' দম নেওয়ার জন্য একটু থামল বাচনি।

মোহনার কিন্তু তর সইল না। তৎক্ষণাৎ জিজ্ঞেস করল, 'তারপর?'

'নৌকা মাঝনদীতে যেতে না যেতে পরাশরের গম্ভীর নির্মোহ চোখ আলুলায়িত হয়ে উঠল। স্থান বদল করলেন মুনি, সত্যবতীর কাছ ঘেঁষে বসলেন। ধীবরকন্যা সত্যবতী বুদ্ধিমতী। তিনি বুঝলেন, কিছু একটা হতে যাচ্ছে। সতর্ক হলেন তিনি। অকস্মাৎ পরাশর জড়িয়ে ধরলেন সত্যবতীকে। মৎস্যরূপিণী অদ্রিকার গর্ভে জন্ম বলে সত্যবতীর শরীরে আজন্ম মাছের বিদ্‌ঘুটে গন্ধ। কামান্ধ পরাশরের কাছে সত্যবতীর শরীরের দুর্গন্ধ সুগন্ধ বলে মনে হচ্ছে। সত্যবতী ওই হাড্ডিসার মুনিকে শরীর দিতে অস্বীকার করলেন।' বলল বাচনি।

জানকি বলল, 'ঠিকই তো করেছে। শরীরে কোনো রূপ নেই, যৌবন নেই; চেয়ে বসল কুমারী মেয়ের শরীর! ওয়াক থু।'

বাচনি বলল, 'শরীরে রূপ-যৌবন না থাকলে কী হবে, রতিক্রীড়ার বাসনা তো আছে। কী আকুতিমিনতি সত্যবতীর: "আমি কুমারী, আমার বিয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হয়নি। আমার কৌমার্য হরণ করো না, প্রভু। কিসের প্রভু!" মুনির এককথা : "শরীর দিতে হবে, না হলে ব্রাহ্মণের বাসনা পূরণ না করার মহাপাপে পতিত হবে তুমি, রৌরব নরকে যাবে তুমি। ও হ্যাঁ, কৌমার্যের কথা বলছিলে তুমি? আমি তোমাকে বর দিচ্ছি—তোমার শরীর থেকে মাছের গন্ধ চিরতরে চলে যাবে। বিয়ে হবে তোমার সসাগরা রাজ্যের রাজার সঙ্গে।'"

মোহনা বলল, 'তো, রাজি হয়ে গেলেন সত্যবতী?'

'রাজি কী করে হন? পথ ফুরাবার জন্য জোরে জোরে বৈঠা বাইতে লাগলেন সত্যবতী। পরাশর এ সময় জাপটে ধরলেন সত্যবতীকে। অবলীলায় ভোগ করলেন সত্যবতীকে।' অনেকক্ষণ চুপ করে থাকে বাচনি। দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে, 'এই হলো নারীজীবন। ওই সময় যেমন, এই সময়ও তেমনি। তোমাদের ভাগ্য ভালো যে তোমাদের কড়ি মেলে, কাউকে পছন্দ না হলে ফিরিয়ে দেওয়ার অধিকারও তোমাদের আছে। কিন্তু প্রাচীনকালে ফিরিয়ে দেওয়ার দুঃসাহস কোনো নারীর ছিল না। কামনার পুতুল ছিল তারা।' মোহনার দিকে তাকিয়ে কথা শেষ করল বাচনি।

'এখনো তো আমরা পুরুষের কাম চরিতার্থতার যন্ত্র ছাড়া আর কিছুই নই।' বাচনির কথা শুনতে শুনতে পরিশুদ্ধ বাংলা মোহনাকেও পেয়ে বসেছে।

অন্য বারাঙ্গনারাও প্রায় সমস্বরে বলে উঠল, 'মোহনা ঠিক বলেছে, মোরাও তো পুরুষজাতির হাতের পুতুল, খদ্দের নেওয়ার আগে পুতুপুতু, কাম শেষ হলে কুকুরের মতো দূর দূর।'

এবার শান্ত স্বরে বাচনি বলল, 'এই কথাটা সর্বাংশে সঠিক নয়। অন্তত মোহনার ক্ষেত্রে। চণ্ডক এই কৈবর্তরাজ্যের কত বড় যোদ্ধা, ক-ত খ্যাতিমান তিনি! তিনি কি মোহনার আঁচলে বাঁধা পড়েননি?'

খুশিতে মোহনার দুচোখ ঝিলিক দিয়ে উঠল। সারা মুখে প্রশান্ত তৃপ্তির হাসি ছড়িয়ে পড়ল। মোহনা কৌতুকি ভঙ্গিতে বলল, 'তাই নাকি, মাসি? এই সংবাদ তুমি কোথায় পেলে, মাসি?'

মোহনার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে জানকি বলে উঠল, 'এ কথাটি তুমি ঠিক বলেছ, ঠাকুরকইন্যা। মোরাদের মোহনার আঁচলে বাঁধা রাজপুত্তর চণ্ডক।'

মোহনা কৃত্রিম রাগ মেশানো কণ্ঠে বলল, 'মা...। তুমিও সুর মেলালে মাসির সাথে!' তারপর বাতায়ন দিয়ে দৃষ্টি গলিয়ে গভীর কণ্ঠে মোহনা বলল, 'আজ এত দিন হয়ে গেল, তার দেখা নাই! বাঁধা পড়লে কি কেউ এ রকম করে?'

বাচনি বলল, 'শোনো মেয়ে, অধৈর্য হও কেন? ধৈর্য নারীর অহংকার। এটা তো ডমরনগরের কমবেশি সবাই জানে—চণ্ডক তোমায় প্রাণের চেয়ে বেশি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভালোবাসেন। তাঁর গড়রাজির জন্য মহারাজ ভীম বাধ্য হয়ে শর্বদেবকে আগে বিয়ে করিয়েছেন।'

বাচনির কথায় নিজের অজান্তে মোহনার ডান হাত নবরত্ন হারে উঠে এল। তার মনে জমাট বাঁধা রাগ বা অভিমান কোন জাদুমন্ত্রে গলে যেতে শুরু করল। তার চোখের কোনা চিকচিক করতে লাগল। হঠাৎ মোহনার দুচোখ বেয়ে জলের ধারা নেমে এল। জানকি বা বাচনি অথবা অন্য কেউ কোনো বাধা দিল না। হালকা হোক মেয়েটি। রাগ-অভিমান গলে যাক।

বেশ কিছুক্ষণ পর বাচনি ধীরে ধীরে বলল, 'দেখে নিয়ো তুমি, চণ্ডক তোমার কাছে আসবে। শিগগির আসবে।'

মোহনার বুক চিরে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল। তার মুখে ম্লান হাসি। জানকি বলল, 'তাই যেন হয়, দিদি। বড় অভাগা মেয়ে মোহনা, জন্ম থেকে অভাগা।'

জানকির কথায় কর্ণপাত না করে বাচনি মোহনাকে লক্ষ করে বলল, 'তোমার চোখ সুন্দর—টানা টানা; চোখের কোনা রক্তাভ, মণি কৃষ্ণবর্ণ। তোমার জঘন স্থূল এবং বিস্তৃত, উরু দুটি হাতির শুঁড়ের মতো, তোমার গোল সমুন্নত স্তন দুটি তালের মতো সুগঠিত। তোমার কণ্ঠের হার, অঙ্গের গন্ধ, পরিধেয় বস্ত্র—সবই তোমার যোগ্য। অবধ, বৈশালি, চম্পকনগরের তাবড় তাবড় বারাঙ্গনাপল্লিতে তোমার সমকক্ষ বারাঙ্গনা পাওয়া ভার। চণ্ডকের পছন্দের প্রশংসা করতে হয়। তিনি তোমাকে ভালোবেসে তোমার রূপের যোগ্য মর্যাদা দিয়েছেন।'

বেলা গড়িয়ে গেছে কবে। জানকিরা টের পায়নি। হঠাৎ বাইরে চোখ রেখে অলকা বলল, 'সন্ধ্যা হলো বলে। অতিথি আসার সময় হলো গো, দিদি।'

সংবিৎ ফিরল সবার। এতক্ষণ বাচনির কথায় মগ্ন ছিল। অলকার কথায় উঠে দাঁড়ানোর প্রস্তুতি নিল সবাই। মোহনা উঠে সিন্দুক খুলল। বাচনির হাতে মোটা দাগের দক্ষিণা গুঁজে দিল।

যেতে যেতে বাচনি গেয়ে উঠল—

সেই ত উজ্জ্বল রহে রসে ঢাকা অঙ্গ।
কাম হৈতে জর্ম প্রেম নহে কাম সঙ্গ ॥
লৌহকে করয়ে সোনা লৌহ পরসিয়া।
তৈছে কাম হৈতে প্রেম দেখ বিচারিয়া ॥

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দশ

পরদিন গোধূলিতে একজন প্রহরী এসে বলে গেল, আজ রাতে যুবরাজ চণ্ডক আসবেন, আসবেন মোহনার ঘরে। প্রহরীর সঙ্গে মোহনার সাক্ষাৎ হয়নি। সে ছিল গৃহাভ্যন্তরে—সাজ-দর্পণের সামনে। ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে নিজেকে দেখছিল মোহনা। গত দিন বাচনি মাসি তার দেহসৌষ্ঠবের প্রশংসা করে গেছে। অনেক কথা বলেছে মাসি। সব কথার মধ্য থেকে এ কথাটি বারবার মনে পড়ছে—তোমার গোল সমুন্নত স্তন দুটি তালের মতো সুগঠিত। দর্পণে নিজেকে দেখতে দেখতে বারবার চোখ যাচ্ছিল স্তনযুগলের ওপর। কপাট বন্ধ এখন। বসন সরিয়ে স্তন দুটিকে মুক্তি দিল মোহনা। সত্যিই তো, তার স্তনযুগল সুগঠিত, লোভনীয় এবং উন্নত। একটুও আনত হয়নি। অপলক তাকিয়ে থাকল মোহনা বোঁটাসমৃদ্ধ পয়োধরের দিকে। মন গভীর পুলকে নেচে উঠল। শরীরজুড়ে মৃদু কম্পন। নিজের বুকের দিকে এর আগে কোনো দিন এ রকম করে তাকায়নি কেন? বড় অচেনা লাগল তার। সেই কবে মালা ছেঁড়ার প্রথম রাতে চণ্ডক আকোটা কলি নিয়ে খেলেছিল। তারপর কত দিন চলে গেছে! চণ্ডক এসেছে বারবার, অনেকবার। প্রথম দিনের বেদনা পরে সুখে রূপান্তরিত হয়েছে। চণ্ডকের স্পর্শে কুঁড়ি প্রস্ফুটিত পুষ্পে পরিণত হয়েছে। নিজের পয়োধর দেখতে দেখতে মোহনার মন হঠাৎ বেদনায় ভরে উঠল। আঁচল দিয়ে বুক ঢেকে ফেলল সে। কী হবে এসব দেখে আর ভেবে? যার জন্য এই শরীর, সে তো আসে না। এই কুচযুগল, এই রসময় দেহ—সবই অসার। ভাবতে ভাবতে মোহনার অকস্মাৎ চোখ পড়ল দেয়ালে ঝোলানো লেখাটার ওপর। সেই কবে অলকা মাসি লাল-হলুদ সুতার ফোঁড়ে ফোঁড়ে ওই শব্দগুলো ফুটিয়ে তুলেছিল সাদা কাপড়ে! পরে আয়না দিয়ে বাঁধাই করে মোহনার ঘরের দেয়ালে ঝুলিয়ে দিয়েছিল ওটি। আজ, এই আঁধারলাগা সন্ধ্যায় মোহনার নজর আটকে গেল ওই শব্দমালায়। তাতে লেখা—

পুরুষ তমালতরু প্রেম অধিকারী,
নারী যে মাধবীলতা আশ্রিতা তাহারি।

হঠাৎ খিলখিল করে হেসে উঠল মোহনা। ব্যঙ্গের সুরে বলল, 'তমালতরু,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আশ্রিতা, মাধবীলতা! মাধবীলতা যে মাটিতে গড়াগড়ি যায় গো, তমালতরু তুমি কি তার সংবাদ রাখো?'

ওই সময় বন্ধ কপাটে ঠুকঠুক শব্দ হলো।

'কে?' নিজেকে সংযত করে বসন ঠিক করতে করতে জিজ্ঞেস করে মোহনা।

'আমি ধনারাম গো, দিদি। দরজা খোলো। সংবাদ আছে।'

বারাঙ্গনাপল্লির মানুষ বলে—ধনারামকে ঈশ্বর নারী বানাতে বসেছিলেন। বানানো শেষ হলে একটুখানি কাদা ঈশ্বরের হাতে থেকে গিয়েছিল। ওই কাদাকে সামান্য লম্বা করে ধনারামের যৌনাঙ্গের জায়গায় লাগিয়ে দিয়েছিলেন। তাই ধনারাম নারী হয়ে না জন্মে পুরুষ হয়েই জন্মাল। পুরুষাঙ্গের কারণে সে পুরুষ হলো বটে, তার চলন-বলন কিন্তু থেকে গেল নারীর মতন। ছোটখাটো ধনারাম কোথা থেকে ভাসতে ভাসতে এই পল্লিতে এসে পৌঁছাল। মোহনার চোখ পড়ল একদিন তার ওপর। তাকে আশ্রয় দিল মোহনা। সেই থেকে সে মোহনার ফাই-ফরমাশ খাটে। মোহনার দরজা পাহারা দেয়। মোহনা যে চণ্ডকের—এটা সবাই জেনে গেছে। মোহনার ঘরের দিকে ট্যারা চোখে তাকানোর দুঃসাহস দেখায় না কেউ। তার পরও মোহনার দরজায় ধনারাম বসে থাকে, সর্বক্ষণ।

তার হাঁটা মেয়েদের মতন। পাছা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে হাঁটে সে; কথা বলে বাঁ হাত নেড়ে নেড়ে। কণ্ঠও তার চিকন, মেয়েদের মতো।

দরজা খুলল মোহনা। ঘরের মধ্যে আঁধার আঁধার। মোহনা জিজ্ঞেস করল, 'কী রে ধনা, কী সংবাদ?'

ধনার ওই এক অভ্যেস—শ্রোতাকে উদ্বিগ্ন রাখা। শ্রোতাকে সংবাদের অর্ধেক শুনিয়ে সে চুপ মেরে যায়। শ্রোতা বারবার জানতে চায় সংবাদের পরের অংশটি, ধনা কোনো উত্তর না দিয়ে অন্য কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ে অথবা বাঁ হাত দিয়ে পাছা চুলকাতে থাকে কৃত্রিম উদাসীনতা নিয়ে। আজও হয়েছে তা-ই। মোহনার 'কী সংবাদ'—এ প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে ধনারাম বলে উঠল, 'আরে দিদি, ঘর যে আন্ধার গো' বলে সে দ্রুত ঘরে ঢুকে গেল। দেয়ালের খুপরিতে রাখা প্রদীপ জ্বালাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল সে।

এদিকে মোহনার তর সইছিল না। দ্রুত ধনারামের কাছে গিয়ে উঁচু গলায় বলল, 'তোমাকে জিজ্ঞেস করলাম, কী সংবাদ; তুমি তার উত্তর না দিয়ে প্রদীপ জ্বালাতে লাগলে যে?'

শেষ প্রদীপের সলতেয় আগুন দিতে দিতে ধনারাম বলল, 'দেখছ না দিদি,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঘর আন্ধারে ভরে গিছে। আন্ধার ঘরে কি শুভ সংবাদ দেওয়া যায়?'

'আরে, বলবি তো তুই, কী শুভ সংবাদ,' রাগী কণ্ঠে বলল মোহনা।

'আসবে, আজকে আসবে।' মোহনার ওপর বক্রদৃষ্টি ফেলে ধনারাম বলল।

এবার কঠোর কণ্ঠে মোহনা বলে উঠল, 'ধুত্তুরি, এইসব ছাই-ঝাঁটা কী বলছ তুমি? সেই প্রথম থেকে রসিকতা করে যাচ্ছ আমার সাথে। যাও, বের হও আমার ঘর থেকে। তোমার শুভ সংবাদের দরকার নেই আমার।'

ধনারাম ভয় পেয়ে গেল এবার। ভয় খাওয়া কণ্ঠে বলল, 'ভুল হয়ে গেছে, দিদি, প্রহরী এসেছিল গো। তোমার কপাট তখন বন্ধ ছিল। আমারে সামনে পেয়ে বলল, "তুই কে রে?" আমি বললেম, আমি মোহনা দিদির ভাই হই গো। শুনে প্রহরী কী বইল্ল জানো গো, দিদি?'

মোহনার কপাল কুঁচকে তিন ভাঁজ। চোখ লাল। নাক দিয়ে গরম হাওয়া বেরোতে লাগল। বজ্র ফাটানো গলায় বলল, 'দূর হ তুই এখান থেকে। তোকে যাতে আর কোনো দিন আমার সামনে না দেখি।' বলে ধাক্কা দিয়ে ধনারামকে ঘরের বাইরে বের করে দিল মোহনা। দড়াম করে দরজা বন্ধ করতে যাবে, ওই সময় ধনারাম বলে উঠল, 'যুবরাজ চণ্ডক আইসবে গো, দিদি। হ্যাঁ, প্রহরী তাই বলে গেল মোরে। আজ রাতেই আইসবে তোমার ঘরে।'

ধনারামের কথায় মোহনার সমস্ত শরীরে শিহরণ খেলে গেল। রাগী চোখ কোমল হয়ে এল তার। দরজার দুই পাল্লায় দুই হাত রেখে করুণ চোখে বারান্দায় দাঁড়ানো ধনারামের দিকে তাকিয়ে থাকল কিছুক্ষণ। তারপর কণ্ঠে মমতা ঢেলে ধনারামের উদ্দেশে বলল, 'আগে বলবি তো। এ রকম সংবাদ দিতে এত ধানাইপানাই করছিলি কেন? যা, জানকি মাসির কাছে যা। গিয়ে শুভ সংবাদটা দে। রাতের খাবারের আয়োজন করতে বল রাজপুত্তুরের জন্য।'

'রাতের খাবারের আয়োজন করতে বল রাজপুত্তুরের জন্য'—এ কথার মধ্যে নির্দেশ আছে না অভিমান আছে, তা বুঝতে পারল না ধনারাম। সংবাদটি দেওয়ার জন্য জানকি মাসির ঘরের দিকে দ্রুত পা চালাল সে।

কিন্তু বেশিদূর এগোতে পারল না ধনারাম। দু-একঘর পেরিয়ে একটু সামনে গেছে মাত্র, পেছন থেকে নারীকণ্ঠ শুনতে পেল—'ধনা, ধন গো। ধনটি তোমার আছেনি গো?'

'কে কে' বলে পেছনে ফিরল ধনারাম। দেখল, দরজায় দরজায় দীপাধার নিয়ে নারীরা দাঁড়ানো। কুন্তি দীপাধার পাশে নামিয়ে অতিথির সঙ্গে দরাদরিতে ব্যস্ত। তাহলে কে বলল, ধনটি তোমার আছেনি গো?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যাক। যে-ই বলুক, এ বিষয়ে মাথা ঘামানোর সময় এখন তার হাতে নেই। মোহনার সংবাদটি জানকির কাছে পৌঁছাতে হবে যে। যেই না ধনারাম পেছন ফিরেছে, অমনি আবার আওয়াজ উঠল, 'ধন গো ধন! বড় না ছোট?'

এবার ধনারামের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেল। চিৎকার করে উঠল সে, 'কুন ছিনালের বিটি গো! দেখতে চাইলে ডাক না মোরে ঘরে। ছোট না বড়, দিখিয়ে দেব।'

ওপাশ এবার চুপচাপ। রাগ নিয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল ধনারাম, মনে মনে গজরাতে লাগল। হঠাৎ তার মনে পড়ে গেল মোহনার কথা, চণ্ডকের রাতের খাবারের কথা। দ্রুত এগিয়ে গেল সে সামনের দিকে।

'এত্ত দেরিতে এলে তুমি? সেই কখন এসেছিলে!' চণ্ডকের মুখের কাছে মুখ এনে মোহনা বলল। অতুলনীয় সাজে সেজেছে আজ মোহনা। তার কথার কোনো জবাব দিল না চণ্ডক। অপলক চোখে তাকিয়ে থাকল মোহনার দিকে। তার কপালে-কপোলে স্বেদবিন্দু। পুরুষ্ট ঠোঁটে থিরথিরে কম্পন।

মোহনা চণ্ডকের বুকে মুখ ঘষতে ঘষতে আবার জিজ্ঞেস করল, 'আমার প্রশ্নের কোনো উত্তর দিলে না যে তুমি!'

'একটু অসুবিধা ছিল,' মৃদুকণ্ঠে জবাব দিল চণ্ডক।

'কী অসুবিধা?'

'বলা যাবে না।'

'কেন বলা যাবে না?'

একটু নড়েচড়ে বসল চণ্ডক। তারপর বলল, 'দেখো, আমাদের দেশ এখন ভালো নেই। পাল রাজা রামপাল যেকোনো মুহূর্তে এই বরেন্দ্রি আক্রমণ করতে পারে। রাজ্যজুড়ে যুদ্ধের প্রস্তুতি চলছে। আমাকেও ব্যস্ত থাকতে হচ্ছে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়ে।' এক ঝটকায় মোহনাকে বুকে টেনে নিয়ে গাঢ় কণ্ঠে চণ্ডক আবার বলল, 'তাই আসতে একটু দেরি হলো গো।'

ক্লান্ত অথচ পুলকিত দেহে দুজনে পাশাপাশি চিত হয়ে শুয়ে আছে। চণ্ডকের ডান হাতটি কিছুক্ষণ আগে মর্দিত-মথিত মোহনার স্তন ছুঁয়ে আছে। দুজনে চুপচাপ। বেশ কিছু সময় পার হয়ে যাওয়ার পরও মোহনা কথা বলছে না দেখে চণ্ডক জিজ্ঞেস করে, 'কী ভাবছ, মোহনা?'

'কিছু না।'

'ভাবছ তো কিছু একটা, দেখে তো তা-ই মনে হয়।'

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'এমনি এমনি চুপ করে আছি।'

চণ্ডক এবার পাশ ফিরল। মোহনাকে বুকে চেপে ধরে বলল, 'দেখো মোহনা, তোমার কাছে এত দিনের আসা-যাওয়া। এত দিনে তোমার মনের ভাব আর দেহের ভাষা তো আমার বুঝে ফেলা উচিত। কী বলো তুমি? বুঝিনি?'

এবার মোহনাও পাশ ফিরল। দুজনে মুখোমুখি। দুজনের ঠোঁটের ব্যবধান সামান্য। গাঢ় অথচ উদ্বিগ্ন কণ্ঠে মোহনা বলল, 'একটা না, মনে চলছে দুটো ভাবনা।'

'প্রথমটা বলো,' আলিঙ্গনে আবদ্ধ মোহনাকে বলল চণ্ডক।

'যুদ্ধে যাবে তুমি, শুনেছি পালরা বৌদ্ধ হলেও প্রচণ্ড হিংস্র। আমার বুক কাঁপছে তোমার জন্য,' বলল মোহনা।

'শুধু আমার জন্য, দেশের জন্য নয়? শোনো মোহনা, আমাদের সৈন্যরা দুর্ধর্ষ। চাষা-মজুর-হেলে-জেলে থেকে কামার-কুমার-মাঝি-তৈলকার পর্যন্ত সবাই যোগ দিচ্ছে কৈবর্ত বাহিনীতে। রামপালের এত ক্ষমতা নেই রাজা ভীমকে পরাজিত করার। তুমি নিশ্চিন্ত থাকো। দেশ আমাদের স্বাধীন থাকবেই,' বলল চণ্ডক।

'কেউ যদি বিশ্বাসঘাতকতা করে, সমরনায়কদের মধ্যে কেউ? অমাত্যদের মধ্যে কেউ? লোভে পড়ে যদি কেউ পাল রাজার দলে গিয়ে ভেড়ে?' মোহনা জিজ্ঞেস করে।

'এই বরেন্দ্রির সবাই দেশপ্রেমিক। দেশের স্বাধীনতা বরেন্দ্রির মানুষের কাছে সবকিছুর ঊর্ধ্বে। এই দেশে বিশ্বাসঘাতকের জায়গা নেই। আর কেউ যদি করেও বিশ্বাসঘাতকতা, তার মুণ্ড এই বরেন্দ্রির মাটিতে গড়াগড়ি যাবে, তার রক্তে ভিজে যাবে এই দেশের মাটি,' উত্তেজিত কণ্ঠে চণ্ডক কথাগুলো বলে গেল।

'তা-ই যেন হয়,' বলে চুপ মেরে যায় মোহনা।

'তোমার দ্বিতীয় ভাবনা?'

'ওটা নাই বা বললাম। ওই ভাবনাটা শুধু আমার হয়েই থাক।'

চণ্ডক অভিমানের সুরে বলল, 'ঠিক আছে। এত দিনে বুঝলাম...।'

'কী বুঝলে এত দিনে?'

'বুঝলাম, তুমি আমাকে ভালোবাসো না। এত দিন যা বলেছ, যা করেছ সব কৃত্রিম, লোক দেখানো।'

মোহনা ঝাঁপিয়ে পড়ল চণ্ডকের বুকে। বুকে মৃদু করাঘাত করতে করতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বলল, 'বলো তুমি, বলো কেন এ কথা বললে?'

চণ্ডক নির্বিকার ভঙ্গিতে বলল, 'যদি আমাকে তুমি তোমার ভাবতে, তাহলে তোমার সকল সুখের আর দুঃখের ভাগিদার করতে আমাকে। তোমার ভাবনারও অংশীদার করতে। কই, করলে না তো!'

'আমি তোমাকে বিরক্ত করতে চাই না বলেই বলতে চাইনি আমার দ্বিতীয় ভাবনার কথা।'

'তুমি ভাবলে কী করে যে আমি বিরক্ত হব!' হঠাৎ বিছানায় সোজা হয়ে বসল চণ্ডক। দুই হাত দিয়ে মোহনার কাঁধ ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বলল, 'বলো মোহনা, তোমার দ্বিতীয় ভাবনা কী?'

মোহনা আলতো হাতে চণ্ডককে শয্যায় চিত করে শুইয়ে দিল। সে-ও পাশে শুয়ে পড়ল। তারপর বলতে শুরু করল, 'তোমাকে আমার দ্বিতীয় ভাবনার কথা বলার আগে কিছু পুরোনো কথা বলা দরকার।'

কিছুক্ষণ কী যেন ভাবল মোহনা। তারপর কড়িকাঠের দিকে তাকিয়ে থাকল। তারপর অনুচ্চ কণ্ঠে বলতে শুরু করল। চণ্ডকের মনে হতে লাগল, একটি বালিকার কণ্ঠ বহুদূর থেকে বাতাসে ভর করে ভেসে আসছে তার কানে।

মোহনা বলছে, 'ডমরনগর থেকে বহু ক্রোশ উজানে গাঙ্গী নামে একটি গাঁ আছে। সেই গাঁ থেকে আরেকটু এগিয়ে গিয়েই কালিন্দী যমুনার সাথে মিলেছে। গাঙ্গী আর দশটা জেলেপল্লীর মতো একটি পল্লি। কালিন্দীর পাড় ঘেঁষেই পল্লিটি। গাছগাছালি ছিল, পাখপাখালি ছিল। নদী ভরা মাছ। ঘরে ঘরে অভাব ছিল না।'

'এটা তো বরেন্দ্রির সব পল্লির চিত্র। মহারাজ ভীমের সুশাসনে বরেন্দ্রির প্রতিটি ঘর থেকে অভাব দূর হয়েছে,' চণ্ডক বলে।

'সব পল্লির একরকম চিত্র ঠিকই, কিন্তু গাঙ্গীর চিত্র একটু ভিন্ন রকম।'

'কী রকম?'

'প্রতি ঘরে ভালোবাসা ছিল। পরস্পরের মধ্যে মধুর সম্পর্ক ছিল।'

'বরেন্দ্রির এত গ্রাম থাকতে আজ হঠাৎ গাঙ্গীর কথা বলছ কেন?'

জল-চিকচিক চোখে মোহনা বলল, 'ওটা আমার গ্রাম। ওখানেই জন্ম আমার।'

'কী বললে?'

'হ্যাঁ, ওখানেই নাকি জন্মেছিলাম আমি।'

চণ্ডক চুপ মেরে থাকল কিছুক্ষণ। মোহনা অপেক্ষা করে থাকল চণ্ডকের কথার জন্য। চণ্ডক ধীরে ধীরে বলল, 'গাঙ্গীর মেয়ে এখানে এলে কী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করে? এই পল্লিতে?'

কেন জানি মোহনার মনটা হঠাৎ বিষিয়ে উঠল। এক গভীর যন্ত্রণা তার ভেতর আথালিপাথালি করতে লাগল। তার অন্তরের কোমলতা চকিতে উধাও হয়ে গেল। রূঢ় কণ্ঠে মোহনা বলে উঠল, 'তোমাদের জন্য, তোমরা যারা পরনারীলোভী, দেহসম্ভোগের মধ্যে তোমরা যারা মত্ত থাকো—তাদের জন্য আমার এই হাল, আমাদের এই অবস্থা।'

চণ্ডক স্তম্ভিত চোখে মোহনার দিকে তাকিয়ে আছে। এ কোন মোহনা? নরমশরম কোমল হৃদয়ের মোহনা তো এ নয়। মোহনার আর্তি কোথায় গেল? চোখের স্নিগ্ধতা কোথায় গেল? কণ্ঠের লালিত্য কোথায় গেল? তাহলে কি গণিকারা এ রকম? চোখের পর্দা নেই তাদের? পুরুষজাতির প্রতি এত ঘৃণা মোহনার? তাহলে তার প্রতি মোহনার ভালোবাসা! ওটা কি অভিনয় তাহলে?

চণ্ডকের ভেতরটা কথা বলে উঠল—চণ্ডক, তুমি ওভাবে ভাবছ কেন? মোহনার দিক থেকে একটু ভাবো। দিনের পর দিন এই বারাঙ্গনাপল্লির নারীরা শরীর দিতে বাধ্য হয়। কোনো বাছবিচার নেই। খোঁড়া, ল্যাংড়া, কুষ্ঠরোগী, বুড়া, অন্ধ, কুঁজো, কদাকার—যারাই আসুক, তাদের সঙ্গে শুতে হয় তাদের। তাদেরও তো ঘৃণা-পছন্দ থাকতে পারে! কিন্তু বাস্তবে তাদের পছন্দের কোনো দাম নেই। এগুলো দেখতে দেখতে, শুনতে শুনতে মোহনার অন্তরে কামমত্ত পুরুষদের বিরুদ্ধে ঘৃণা দলা পাকিয়ে উঠতেও তো পারে! তুমি প্রচণ্ড ভালোবাসো মোহনাকে। মোহনাও যে তোমাকে নিবিড়ভাবে ভালোবাসে, তার প্রমাণ এরই মধ্যে বারবার সে দিয়েছে। শান্ত হও, চণ্ডক। শান্ত কণ্ঠে মোহনাকে জিজ্ঞেস করো—কী হয়েছে, মোহনা? তুমি এত উত্তেজিত হয়ে পড়লে কেন? বলো তোমার মনের বেদনাটি, খুলে বলো আমাকে, মোহনা।

চণ্ডক শান্তভাবে নরম কণ্ঠে মোহনাকে বলল, 'বলো মোহনা, তোমার মধ্যে যত দুঃখ, যত জ্বালা আছে সব ঝেড়ে দাও আমার ওপর। আমি সব বুক পেতে নেব।'

চণ্ডকের কথায় মোহনা থমকে গেল। হঠাৎ নিজেকে অপরাধী বলে মনে হতে লাগল তার। গাঙ্গী থেকে তার এই পতিতাপল্লির বাসিন্দা হওয়ার পেছনে তো চণ্ডকের কোনো হাত নেই! সে কেন শুধু শুধু উত্তেজিত হলো?

অপরাধী কণ্ঠে মোহনা বলল, 'আমার ভুল হয়ে গেছে। উত্তেজনায় আমি অন্ধ হয়ে গিয়েছিলাম। আমাকে ক্ষমা করো।'

চণ্ডক শোয়া থেকে উঠে বসল। পরম আদরে মোহনাকে কাছে টেনে নিল। বলল, 'বাদ দাও ওসব। এখন বলো, তোমার দ্বিতীয় ভাবনার কথা।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মোহনা নরম সুরে বলল, 'গাঙ্গী থেকে আমাকে চুরি করে আনা হয়েছিল। সনকাই চুরি করেছিল। জানকি মাসি আমাকে নিজের মেয়ের মতো লালনপালন করেছিল বলে আজ আমি তোমার মোহনা হতে পেরেছি।'

তারপর মোহনা গাঙ্গীকে ঘিরে তার মধ্যে বালিকা বয়সের যত টুকরো টুকরো স্মৃতি জমা হয়ে ছিল, যে কজন খেলার সাথির নাম তার মনে ছিল, তাদের ঘিরে যতগুলো ঘটনা ছিল—তার সবই চণ্ডককে বলে গেল। শুনতে শুনতে চণ্ডকের মাথা হঠাৎ চক্কর দিয়ে উঠল। দুই চোখ আঁধার হয়ে এল অকস্মাৎ। বুকের ভেতরে প্রচণ্ড কষ্টের একটা মোচড় অনুভব করতে লাগল চণ্ডক। হঠাৎ তার চোখে ভেসে উঠল—একটা জলভরা নদী। সে আরও দেখল—নদীর পাড়ের বাঁধে দু-আড়াই বছরের একটা বালক অঝোর ধারায় কাঁদছে। কিছুক্ষণ পর একজন বলিষ্ঠ পুরুষ শিশুটিকে কোলে তুলে নিল। দৃশ্যগুলো একটার পর একটা চণ্ডকের চোখের সামনে দিয়ে ভেসে গেল। ওই সময়ের কোনো সংলাপ সে মনে করতে পারল না। হঠাৎ তার কানে প্রবল আওয়াজে একটি বাক্য ধ্বনিত হলো, 'পাগলির বেটা। কৌশিল্যা পাগলি, বলাৎকার, মর তুই মর'—এসব শব্দ বজ্রের শক্তিতে তার দুই কানের কাছে ফেটে পড়তে লাগল।

তীব্র যন্ত্রণায় হাহাকার করে উঠল চণ্ডক, 'না, না।' ডানে-বাঁয়ে জোরে জোরে মাথা ঝাঁকাতে লাগল চণ্ডক।

মোহনা হতভম্ব হয়ে গেল। তার জীবনের কথা শুনে চণ্ডক এ রকম পাগলপ্রায় আচরণ করছে কেন? কেন তীব্র যন্ত্রণায় হাহাকার করছে? বুকে হাত বোলাতে বোলাতে মোহনা বলতে লাগল, 'শান্ত হও, শান্ত হও তুমি। আর কোনো দিন আমি তোমাকে আমার ফেলে আসা জীবনের কথা বলব না। সত্যি বলছি, তুমি বিশ্বাস করো—এই তোমার গা ছুঁয়ে বলছি, আর কোনো দিন আমি তোমার কাছে আমার জীবনের কথা বলব না।'

ধীরে ধীরে চণ্ডক শান্ত হয়ে এল। করুণ চোখে মোহনাকে বলল, 'তোমার কোনো দোষ নেই, মোহনা। তুমি ভয় পেয়ো না।' তারপর অতি নিম্নকণ্ঠে বলল, 'তোমার আর আমার মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই, মোহনা। তুমি যেমন স্বজনহারা, আমিও তেমনি।'

রাত গভীর থেকে গভীরতর হতে চলল। বারাঙ্গনাপল্লির সব ঘরের প্রদীপ নিবল, নিবল না শুধু মোহনার ঘরের। বাস্তুহারা, মাতৃপিতৃহারা দুজন নারী-পুরুষ পাশাপাশি শুয়ে থাকল অনেকক্ষণ।

এই সময় বাইরে পথকুকুররা চিৎকার করে উঠল। চণ্ডক বলল, 'মোহনা, তুমি তোমার কথা শেষ করোনি, শেষ করো।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আজ থাক না এসব।'

'না, আমি শুনব। তুমি বলো।'

মোহনা কোনো ভূমিকা না করে বলল, 'আমি আমার মা-বাবাকে দেখতে চাই। শুধু একবারের জন্য আমি গাঙ্গীতে যেতে চাই। জানি, আমার পরিচয় পেয়ে মা-বাবা, পাড়াপড়শিরা আমাকে প্রচণ্ড ঘৃণা করবে, তবু আমি দূর থেকে আমার মা-বাবাকে শুধু একপলক দেখতে চাই। তুমি কি অনুমতি দেবে আমাকে?'

চণ্ডক দৃঢ় কণ্ঠে বলল, 'অবশ্যই তুমি তোমার গ্রাম, তোমার খেলার সাথি, তোমার মা-বাবাকে দেখতে যাবে। আমি শিগগির তোমার যাবার ব্যবস্থা করছি।'

তারপর মোহনার পাশে নিবিড় হয়ে বসে গাঢ় কণ্ঠে চণ্ডক বলল, 'তোমার জন্য একটা নতুন বজরা তৈরি হবে। বজরার ওপরে থাকবে পাটাতন। পাটাতনে থাকবে সেগুন কাঠের চতুষ্কী। চতুষ্কীর ওপরে থাকবে ছাতা, একজন সে ছাতা ধরে থাকবে। রং আর রঙিন পতাকায় সজ্জিত হবে সে বজরা। বহুরঙা পাল খাটানো হবে তাতে। হালে থাকবে মাঝি। বজরার এখানে-ওখানে তলোয়ার হাতে দাঁড়িয়ে থাকবে প্রহরীরা। তুমি সেগুন কাঠের চতুষ্কীতে হেলান দিয়ে বসবে। কালিন্দীর মৃদু বাতাসে তোমার আঁচল দোল খাবে। তরতর করে বজরা এগিয়ে যাবে গাঙ্গীর দিকে। তোমার চোখে ভাসবে ফেলে আসা শৈশব, খেলার সাথিদের কোমল-কচি মুখ। আর ভাসবে তোমার মা-বাবার চেহারা। কী আনন্দের দিন!'

মোহনা নিষ্পলক চোখে চণ্ডকের দিকে তাকিয়ে থাকল। নির্বাক মোহনা অভূতপূর্ব আনন্দে প্লাবিত হতে থাকল।

এগারো

রামাবতিতে মন্ত্রণাসভা বসেছে। রামপাল বসেছেন সিংহাসনে। তাঁর খুব কাছ ঘেঁষে বসেছেন মথনদেব, রামপালের পুত্র বিত্তপাল, প্রধান সেনাপতি বিশুদ্ধানন্দ, অর্থমন্ত্রী আর গুপ্তচরপ্রধান সত্যব্রত।

সত্যব্রত বললেন, 'ভীমরাজ্য আক্রমণ করার এখনই উপযুক্ত সময়, মহারাজ।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিত্তপাল বলল, 'কেন এই সময়টাকে বরেন্দ্রি আক্রমণের উপযুক্ত সময় মনে করছেন আপনি?'

প্রশ্নটা বিত্তপাল করলেও সত্যব্রত উত্তর দিলেন মহারাজ রামপালের মুখের দিকে তাকিয়ে। বললেন, 'এখন প্রচণ্ড দাবদাহ। আমাদের বাহিনীতে যে নিয়মিত সৈন্য আছে, তারা কষ্টসহিষ্ণু। গরমের প্রচণ্ডতা আর কঠোর শৈত্য তাদের কাছে সমান সহনীয়। ভীমের বাহিনীতে নিয়মিতের চেয়ে অনিয়মিত সৈন্যের সংখ্যা বেশি। সাধারণ মানুষের সংখ্যা বেশি ভীমের বাহিনীতে। তাদের মধ্যে কষ্টসহিষ্ণুতা কম। দাবদাহ সহ্য করার ক্ষমতা তাদের নেই। আর...।'

'আর কী?' রামপাল জিজ্ঞেস করলেন।

'আমার কাছে যতদূর সংবাদ আছে, ভীম যুদ্ধের প্রস্তুতি এখনো সম্পন্ন করতে পারেননি। পদাতিক, অশ্বারোহী, হস্ত্যারোহী, তিরন্দাজ—এসবের প্রস্তুতি শেষ করেছেন ভীম। কিন্তু নৌযুদ্ধের জন্য যতগুলো পানসি তৈরির আদেশ দিয়েছিলেন ভীম, দাশরা ততগুলো পানসি তৈরির কাজ শেষ করতে পারেনি এখনো। এই মুহূর্তে ভীমের নৌসেনা দুর্বল। আর...।'

সত্যব্রতের মুখের কথা কেড়ে নিয়ে মথনদেব বলে উঠলেন, 'আপনি তো সেই প্রথম থেকে আর আর করে যাচ্ছেন। সবকিছু স্পষ্ট করে বলছেন না কেন?'

সত্যব্রত একপলক মথনদেবের দিকে তাকালেন। মথনদেবের অপমানকে নীরবে হজম করলেন। তারপর রামপালের দিকে তাকালেন সত্যব্রত। বললেন, 'ভীমের তো চার পুত্র, তিনটা নিজের আর চণ্ডক পালিত পুত্র। ভীমের বড় ছেলের নাম শর্বদেব। এই শর্বদেবের সঙ্গে চণ্ডকের বিরোধ চলছে এখন। গৃহকোণ থেকে এই বিরোধ মন্ত্রণাসভা পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে।'

'তাই নাকি, তাই নাকি? সবার আগে কেন বলেননি এই সংবাদ?' মথনদেব বলে উঠলেন।

অপমানের প্রতিশোধ নেওয়ার এই তো সময়। অবহেলার চেয়ে বড় অপমান আর কী আছে? মথনদেবের প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে সত্যব্রত আগের মতো রামপালের উদ্দেশে বললেন, 'যুদ্ধক্ষেত্রে শর্বদেব এবং চণ্ডক ভীমের দুপাশে অবস্থান নিয়ে যুদ্ধ করে। এই বিরোধ যুদ্ধক্ষেত্র পর্যন্ত বিস্তৃত হলে পালদের বিপুল লাভ।'

মথনদেব সত্যব্রতের অবহেলা বুঝতে পারলেন। প্রচণ্ড ক্ষোভে কী যেন বলতে যাচ্ছিলেন, ঠিক এ সময় রামপাল বলে উঠলেন, 'তাহলে সীমান্তে এবং গঙ্গার পাড়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাড়ে আমাদের সৈন্যসমাবেশের আদেশ দিয়ে দিই, আপনারা কী বলেন?'

অর্থমন্ত্রী বললেন, 'দণ্ডভুক্তির নৃপতি জয় সিংহ আর ঢেক্করীয় রাজ প্রতাপ সিংহ ছাড়া অন্যান্য সামন্ত তাঁদের প্রতিশ্রুতি রেখেছেন। পাল রাজকোষে অর্থ পাঠিয়েছেন।'

প্রধান সেনাপতি বিশুদ্ধানন্দ বলে উঠলেন, 'রাজা প্রতাপ সিংহ এবং জয়সিংহ সৈন্যবাহিনী পাঠিয়ে দিয়েছেন। সংবাদ পাঠিয়েছেন—অচিরেই প্রতিশ্রুত অর্থ পাঠাবেন।'

মথনদেব ধীরে ধীরে বললেন, 'মহারাজ, আমাদের সেনাবাহিনী তাহলে সর্বাংশে প্রস্তুত? এবার রাজাদেশের অপেক্ষা।'

রামপাল বললেন, 'মরণপণ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হোন আপনারা। নদীর পাড় এবং সীমান্তের স্কন্ধগুলোতে সৈন্যসমাবেশ করুন। ছোট ছোট দলে বিভক্ত করে সৈন্যদের বরেন্দ্রিতে ঢুকিয়ে দিন। সত্যব্রত বলছেন—ভীমের নৌসেনারা এখনো নড়বড়ে। নৌপথেই সর্বাত্মক আক্রমণের ব্যবস্থা নিন।'

গুপ্তচরপ্রধান কৃপাসিন্ধুর মাধ্যমে বরেন্দ্রি সূর্য ভীমের কাছে সংবাদ পৌঁছে গেল—রামপাল কৈবর্তরাজ্য আক্রমণের নির্দেশ দিয়েছেন। ভীম তাঁর সৈন্যদের চরম সতর্ক থাকার আদেশ প্রদান করলেন। রাজপ্রাসাদ, সৈন্যছাউনি, পোতবন্দর, বাণিজ্যকেন্দ্র, বিপণিবিতান এবং রাজধানীর জনগুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলোতে সেনাপ্রহরা জোরদার করা হলো। রাজপরিবারের সদস্য, রাজন্যবর্গ এবং রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ পদাধিকারীদের সতর্কতার সঙ্গে চলাফেরা করার কড়া নির্দেশ জারি করলেন মহারাজ ভীম।

বরেন্দ্রির সর্বত্র রণদামামা বেজে উঠল। কৈবর্ত-সৈন্যের পদবিক্ষেপে রাজপথ প্রকম্পিত হতে থাকল। অস্ত্রের ঝনঝনানিতে বাতাস আলোড়িত। জনমানুষের কণ্ঠে ধ্বনিত হলো—জয়, বরেন্দ্রির জয়; জয়, বরেন্দ্রি সূর্য ভীমের জয়। মোরাদের স্বাধীনতায় হাত দেবে যারা, তাদের হাত গুঁড়িয়ে দেব মোরা।

এই যখন বরেন্দ্রির অবস্থা, এক বিকেলে চণ্ডক গিয়ে উপস্থিত হলো অর্থমন্ত্রী বিশ্বমঙ্গলের কাছে। বিশ্বমঙ্গল তখন অধস্তন রাজন্যদের নিয়ে যুদ্ধসময়ে দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো কীভাবে ঠিক রাখবেন, এ নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনায় ব্যস্ত ছিলেন। চণ্ডক অনুমতি ছাড়া কক্ষে প্রবেশ করে বিশ্বমঙ্গলের সামনে উদ্ধত ভঙ্গিতে দাঁড়াল। অর্থমন্ত্রী চোখ কুঁচকে চণ্ডকের দিকে তাকালেন। ক্ষোভ তার ভেতরে দলা পাকিয়ে উঠল। কোনোরকমে তা চেপে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রেখে বিরক্ত কণ্ঠে বিল্বমঙ্গল বললেন, 'চণ্ডক, খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা হচ্ছে এখানে। সভাশেষে এসো তুমি, কথা হবে তখন।'

'আমার আসার কারণটাও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। আর আপনি ফেরাচ্ছেন কাকে? রাজপুত্র চণ্ডককে?' উদ্ধত ভঙ্গিতে কথাগুলো বলল চণ্ডক।

অর্থমন্ত্রী হঠাৎ হো হো করে হেসে উঠলেন। সভার অন্যরা সচকিত হয়ে অর্থমন্ত্রীর দিকে তাকাল। তারা অর্থমন্ত্রীর অট্টহাসির কারণ বুঝতে পারল না। কিন্তু যার বোঝার, সে বুঝে গেল। নিজেকে রাজপুত্র বলায় কি অর্থমন্ত্রী এভাবে উচ্চহাস্য করে উঠলেন?

রুক্ষ কণ্ঠে চণ্ডক জিজ্ঞেস করল, 'আপনি হঠাৎ এ রকম হেসে উঠলেন কেন?'

'কই, হেসেছি নাকি? যদি হেসে থাকি, তাহলে হেসেছি পুরোনো একটা কথা মনে পড়ে যাওয়ার জন্য। যাক, আমার কাছে কী জন্য এসেছ, বলো।'

কী কথা মনে পড়ল বিল্বমঙ্গলের? রাজা ভীম আমাকে রাস্তা থেকে কুড়িয়ে এনে রাজপ্রাসাদে স্থান দিয়েছেন—এই কথা মনে পড়ে যাওয়ায় হেসে উঠলেন অর্থমন্ত্রী? না আমি জারজ সন্তান, পাগলির ছেলে—এই কথা মনে পড়ায়? বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠতে চাইল চণ্ডকের মন। নিজেকে সংযত করল সে। শান্ত স্বরে বলল, 'আমার কিছু কপর্দক লাগবে, দিন।'

'কপর্দক! এই সময়ে!'

'হ্যাঁ, কপর্দক, এ সময়ে। এ মুহূর্তে আমার পঞ্চাশ পণ কপর্দক লাগবে।'

বিস্মিত কণ্ঠে অর্থমন্ত্রী বললেন, 'পঞ্চাশ পণ। এই যুদ্ধাবস্থায় পঞ্চাশ পণের মূল্য কত জানো তুমি, চণ্ডক?'

'অতশত বুঝি না। আমার কপর্দক লাগবে আর আপনি তা দেবেন, এই বুঝি।'

'এত কপর্দক দিয়ে কী করবে তুমি?'

'বজরা বানাব।' বলেই থমকে গেল চণ্ডক।

'বজরা দিয়ে কী করবে তুমি? বজরা দিয়ে তো যুদ্ধ করা যায় না।'

চণ্ডক মুখ ফসকে বলে ফেলেছে—বজরা বানাব। বজরার কথা না বললেও তো চলত—ভাবল চণ্ডক। সে রাজপুত্র, তার কপর্দক চাই—এই তো যথেষ্ট। কপর্দক কী কাজে ব্যবহৃত হবে, তার ব্যাখ্যা অর্থমন্ত্রীকে দেওয়ার প্রয়োজন কী? প্রয়োজন ছিল না। এখন যখন মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেছে, তারপর কী করা যায়! সত্যি কথাটা মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেছে, গেছে। আমার কপর্দক চাই।

'বজরা দিয়ে কী করব, তার ব্যাখ্যা আমি আপনাকে দিতে রাজি নই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আপনার কাছে কপর্দক চেয়েছি, দেবেন। ব্যস,' চণ্ডক নিস্পৃহভাবে বলল।

বিল্বমঙ্গল বললেন, 'তুমি চাইলেই আমি দিতে পারি না। এই অর্থ খরচের যথাযোগ্য ক্ষেত্র ও প্রয়োজনীয়তা দেখানো চাই। কপর্দকের পরিমাণ কম হলে না হয় একটা কথা ছিল। তুমি যে পরিমাণে তা চাইছ, তার জন্য মহারাজের অনুমোদন লাগবে। তা ছাড়া এ সময়ে প্রতিটি কপর্দকের বিশেষ গুরুত্ব আছে।'

'আমি এই বজরা বানাব একজনের প্রয়োজন আর বিনোদনের জন্য।' চণ্ডক বলল।

অর্থমন্ত্রী বললেন, 'যার জন্য বজরা বানাবে সে কে? রাজপরিবারের কেউ? আর বিনোদনের কথা বললে তুমি। এখন দেশে যুদ্ধসময়। জরুরি অবস্থা। এ সময় বিনোদনের চেয়ে যুদ্ধ অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ।' একটু থেমে ব্যঙ্গের সুরে অর্থমন্ত্রী আবার বললেন, 'এই ভয়ংকর সময়ে রাজপরিবারের কোন সদস্যের বিনোদন-স্পৃহা উথলে উঠল, বুঝতে পারছি না। তুমি এখন যাও, চণ্ডক, আমার জরুরি সভাটি শেষ করতে দাও।'

'আপনি কপর্দক না দেওয়া পর্যন্ত আমি এখান থেকে যাচ্ছি না,' চণ্ডক দুর্বিনীত ভঙ্গিতে বলল।

দুজনের উষ্ণ বাক্যবিনিময় দেখে মন্ত্রকেরা উসখুস করতে লাগল। বিনীতভাবে অর্থমন্ত্রীর দিকে তাকিয়ে সভা ত্যাগের অনুমতি চাইল। অর্থমন্ত্রী চোখের ইশারায় তাদের চলে যেতে বললেন। মন্ত্রকেরা চলে গেলে রূঢ় কণ্ঠে বিল্বমঙ্গল বললেন, 'তুমি কি জোর করে আমার কাছ থেকে অর্থ আদায় করতে চাও, চণ্ডক?'

'জোর করে নয়, অধিকারবলে।'

'কোন অধিকার? কিসের অধিকার?'

'অধিকার এ জন্য যে আমি রাজপুত্র। অধিকার এ জন্য যে আমি এই বরেন্দ্রির একজন গুরুত্বপূর্ণ মানুষ। আপনি কি ভুলে গেছেন, যুদ্ধে আমার অবদানের কথা! আপনি কি এ-ও ভুলে গেছেন, আমি একজন সমরনায়ক?'

'তুমি অন্যতম সমরনায়ক, একমাত্র নও। তোমার মতো যুদ্ধে অবদান রাখতে পারে এমন মানুষ এই কৈবর্তভূমিতে আরও অনেক আছে। আর রাজপুত্রের অধিকারের কথা বলছ, তুমি কি ভুলে গেছ...।'

'আর একটি শব্দও উচ্চারণ করবেন না, মন্ত্রী বিল্বমঙ্গল। অস্ত্র হাতে তুলে নেওয়ার সুযোগ করে দেবেন না আমাকে।' রোষ-কষায়িত কণ্ঠে চণ্ডক চিৎকার করে উঠল। 'আর হ্যাঁ, এই অর্থ মোহনার জন্য। মোহনার প্রয়োজনের জন্য, মোহনার বিনোদনের জন্য আমি এই কপর্দক দিয়ে বজরা বানাব। আপনি, আপনি কপর্দক দিন, এখনই।' দুই কদম সামনে এগিয়ে আগের মতো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাগতস্বরে বলল চণ্ডক।

এবার দুই হাতে তালি বাজালেন বিল্বমঙ্গল। তড়িৎবেগে আটজন সশস্ত্র দেহরক্ষী প্রবেশ করল কক্ষে। ওদের দেখিয়ে বিল্বমঙ্গল বললেন, 'তুমি এখনই এই স্থান ত্যাগ করো, চণ্ডক। নইলে শক্তির আশ্রয় নিতে বাধ্য হব আমি।'

চণ্ডক তরবারির বাঁটে প্রচণ্ড শক্তিতে ডান হাত ঘষতে লাগল। সতর্ক দেহরক্ষীরা তার আগে অস্ত্র হাতে নিয়েছে। চণ্ডক সগর্জনে বলল, 'এর মূল্য দিতে হবে একদিন তোমাকে, বিল্বমঙ্গল।'

তার দর্পিত বাক্য শুনে দেহরক্ষীরা চণ্ডককে ঘিরে ধরল। নিরুপায় চণ্ডক পেছন ফিরল।

বিল্বমঙ্গল অনুচ্চ স্বরে চিবিয়ে চিবিয়ে বললেন, 'বেশ্যাখোর কোথাকার!'

অপমানিত ব্যর্থ চণ্ডক কালিন্দীর ঘাটের পাশে এক উপলখণ্ডে বসে আছে। আঁধার ঘন হয়ে এসেছে অনেক আগে। ঘাটে বাঁধা নৌকাগুলোতে মিটমিট করে বাতি জ্বলছে। বড় বড় মশাল উজ্জ্বল আলো ছড়াচ্ছে দূরের বাণিজ্যপোত ভেড়ার স্থানটিতে। সামনে কালিন্দীর জল বয়ে যাচ্ছে নীরবে। কিন্তু চণ্ডকের ভেতরটা ঝোড়ো হাওয়ার আথালিপাথালি। অর্থমন্ত্রী তাকে আজ এত বড় অপমান করল! দেহরক্ষী দিয়ে তাকে বের করে দিল কক্ষ থেকে! কপর্দক চেয়েছে সে, চাওয়ার অধিকার আছে বলে। যুদ্ধক্ষেত্রে সে-ই তো জীবন বাজি রেখে মহারাজকে আগলে রাখে। খড়্গের আঘাতে আঘতে শত্রুদের মুণ্ড নামায় সে-ই তো! আর আজ সেই চণ্ডকের এত বড় অপমান!

হঠাৎ তার মোহনার কথা মনে পড়ল। কাল রাতেই তো সে মোহনাকে আশ্বাস দিয়েছে গাঙ্গীযাত্রার। বাহারি বজরার স্বপ্ন দেখিয়েছে সে মোহনাকে। বলেছে, বজরা তোমাকে নিয়ে তরতরিয়ে গাঙ্গীর দিকে এগিয়ে যাবে। আর তুমি ভাববে তোমার মা-বাবার কথা। খেলার সাথিদের সঙ্গে পুনরায় মিলিত হওয়ার দুর্বার আনন্দে তুমি ভাসবে।

'সব ব্যর্থ, সব ব্যর্থ' বলতে বলতে নিজ মাথার দুদিকে দুই হাত দিয়ে থাপড়াতে লাগল চণ্ডক। হঠাৎ করেই হাউমাউ করে উঠল সে। তার কান্না নদীপাড়ের বাতাসকে ভারী করে তুলল।

অর্থমন্ত্রী বিল্বমঙ্গল নিঃসাড় বসে রইলেন। ভেতরে তাঁর প্রচণ্ড আলোড়ন। চণ্ডকের বিরুদ্ধে ক্রোধ দাউ দাউ করে জ্বলছে তার মনে। এ কী ধৃষ্টতা চণ্ডকের! উদ্‌ভ্রম হয়েছে তার। নইলে কেন লাগামছাড়া আচরণ? একজনের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কতটুকু অধঃপতন ঘটলে বেশ্যার মনোরঞ্জনের কথা সদর্পে প্রকাশ্যে বলতে পারে? পাল রাজা এখন কৈবর্তধ্বংসে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। প্রঘাতে প্রঘাতে ডমরনগরকে ধুলায় মিশিয়ে দিতে বদ্ধপরিকর হয়েছেন রামপাল। বরেন্দ্রির আপামর জনগণের মনে প্রত্যাঘাতের ঢেউ আছড়াচ্ছে। আত্মোৎসর্গের মন্ত্রে তারা আজ উজ্জীবিত। বরেন্দ্রভূমির আনাচে-কানাচে ধ্বনিত হচ্ছে—এই ভূমি মোরাদের। এই ভূমি অপবিত্র করলে ওরাদের ছাড়ব না মোরা।

ধীবরেরা মাছ ধরা ছেড়ে, মোদকেরা মিষ্টান্ন বানানো ছেড়ে, তাম্বুলি পান বেচা ছেড়ে, শৌণ্ডিক সুরা তৈরি ছেড়ে, গোয়ালা-নাপিত-ধোপা-তন্তুবায়-কর্মকার-কুম্ভকার-কাংস্যকার-তৈলকার-সূত্রধর নিজ নিজ পেশা ছেড়ে মহারাজ ভীমের পেছনে কাতারে কাতারে দাঁড়িয়েছে। সেই সারিবদ্ধ জনসমুদ্র থেকে ধ্বনি উঠছে—পাল রাজা নিপাত যাক, রামাবতি ধ্বংস হোক।

আর এদিকে, পাষণ্ড চণ্ডক আপাদমস্তক গণিকামগ্ন হয়ে পড়েছে। সমরনায়ক তুমি। কোথায় সৈন্যদের উজ্জীবিত করবে, না, কপর্দক দাও, পঞ্চাশ পণ। কী করবে ওই অর্থ দিয়ে তুমি? বজরা বানাব, ভাসমান বেশ্যালয় বানাব! ওই বজরা জলে ভাসবে, বজরায় ভাসবে ওই গণিকা, আর তুই গণিকাসেবী, তুই জারজ ভাসবি ওই গণিকা মোহনার ওপর!

না, আর নয়। দুর্বিনীত চণ্ডককে আর প্রশ্রয় দেওয়া উচিত হবে না। মহারাজ ভীমের কাছে সব খুলে বলতে হবে।

বিল্বমঙ্গল মহারাজ ভীমের উদ্দেশে যাত্রা করবেন, ওই সময়ে সেখানে উপস্থিত হলো শর্বদেব।

অর্থমন্ত্রীর দিকে তাকিয়ে শর্বদেব জিজ্ঞেস করল, 'কী ব্যাপার, মাননীয় মন্ত্রী! আপনাকে এত বিষণ্ন দেখাচ্ছে কেন? যেন আকাশ ভেঙে পড়েছে আপনার ওপর। কোনো অশুভ সংবাদ? এ রকম বিপর্যস্ত অবস্থায় আগে আপনাকে কখনো দেখিনি। আপত্তি না থাকলে খুলে বলুন।'

বিল্বমঙ্গল একটা নিবিড় দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করলেন। তারপর আনুপূর্বিক সবকিছু শর্বদেবকে খুলে বললেন। সর্বশেষে বললেন, 'চণ্ডকের আচরণ আমার কাছে মোটেই ভালো ঠেকছে না। যুদ্ধ আসন্ন। এই সময় চণ্ডকের এ রকম আচরণ সমস্ত বরেন্দ্রভূমির জন্য অকল্যাণ ডেকে আনবে।' একটু থামলেন অর্থমন্ত্রী। তারপর ইতস্তত ভঙ্গিতে বললেন, 'রাজপুত্রের প্রকাশ্যে বেশ্যাসক্তি ধিক্কারযোগ্য। রাজার জন্য, তোমাদের পরিবারের জন্য অনেক বড় অপমান বয়ে আনছে এই চণ্ডক।'

উষ্ণ কণ্ঠে শর্বদেব বলল, 'কাকে আপনি রাজপুত্র বলছেন? চণ্ডক পাপের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সন্তান, বলাৎকারের ফসল। আমার বাবা পরম যত্নে ওকে পথের ধুলা থেকে তুলে এনে রাজপ্রাসাদে স্থান দিয়েছিলেন। কিন্তু রক্তের দোষ যাবে কোথায়? চণ্ডকের বেশ্যাসক্তি অস্বাভাবিক কিছু কি?'

'তোমার বাবা তাকে পুত্রের মর্যাদা দিয়েছেন।'

'সেই মর্যাদার মূল্য কি সে দিয়েছে?'

'যুদ্ধক্ষেত্রে সে অপ্রতিদ্বন্দ্বী সমরনায়ক।'

'যুদ্ধক্ষেত্রের বাইরে সে দায়িত্বহীন। নির্লজ্জ।'

'দায়িত্বহীন বলছ, ঠিক আছে। নির্লজ্জ বলছ কেন তাকে?'

'নির্লজ্জ না হলে কি বারাঙ্গনার বিনোদনের ব্যাপারে এই সংকটকালে কপর্দকের জন্য জোরাজুরি করে!'

'মহারাজ ভীমের কানে তোলা দরকার বিষয়টি।'

'মহারাজকে জানানো উচিত, এটা ঠিক আছে। কিন্তু এই সময়ে নয়,' চিন্তিত মুখে শর্ব বলল।

বিশ্বমঙ্গল শঙ্কিতচিত্তে জিজ্ঞেস করলেন, 'কেন? এই সময়ে নয় কেন?'

'বাবাকে বিচলিত দেখে এলাম। কৃপাসিন্ধু সংবাদ এনেছে, দু-এক দিনের মধ্যে পালরা কৈবর্তভূমি আক্রমণ করতে যাচ্ছে। বাবাকে দেখলাম গুপ্তচরপ্রধান আর মহাসমরনায়ক কর্ণদেবকে নিয়ে মন্ত্রণায় মগ্ন। এই সময় চণ্ডকের দুর্ব্যবহারের কথা মহারাজের কানে না তোলাই শ্রেয় বলে মনে করছি আমি,' শর্বদেব বলল।

বিশ্বমঙ্গল নিবিষ্ট মনে কী যেন ভাবলেন অনেকক্ষণ। তারপর ধীরে ধীরে বললেন, 'ঠিক আছে। তবে চণ্ডকের ব্যাপারে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে।'

'ঠিকই বলেছেন। চণ্ডকের শিরায় শিরায় দূষিত রক্তের কোলাহল। সে লালিত হয়েছে কৈবর্ত-আশ্রয়ে, কিন্তু তার মধ্যে যে শোণিত প্রবাহিত হচ্ছে, তা পালদের। এরই মধ্যে সে অকৃতজ্ঞতার কাজ করেছে বেশ কয়েকটি। সে জানে, রত্নহারটি আমার স্ত্রীর জন্য আনা হয়েছে। জেনেও সে লুণ্ঠন করেছে। ঝুলিয়েছে কার গলায়? একজন বেবুশ্যের গলায়। বাবা কী করলেন? ভালোবাসার দোহাই দিয়ে, আসন্ন যুদ্ধের অজুহাত দেখিয়ে মাফ করে দিলেন তাকে। পার পেয়ে গেল চণ্ডক। এখন দুঃসাহসে ভর করে আপনার ওপর চড়াও হলো। ভবিষ্যতে আরও কী করবে, কে জানে?' সতেজে কথাগুলো বলল শর্বদেব।

'আমাকে ভাবিয়ে তুলেছে চণ্ডকের এই বেপরোয়া আচরণ। দেখো শর্বদেব, আমি শুধু তোমার পিতার আমলের অর্থমন্ত্রী নই, বরেন্দ্রি সূর্য দিব্যোকের শাসনের সময় আমি অর্থ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পাই। তখন মহারাজ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দিব্যোককে অনেকে উপযাচক হয়ে পরামর্শ দিয়েছিল—মহারাজ, আপনি ভুল করেছেন, অভিজ্ঞতাহীন বিশ্বমঙ্গল নামের এই তরুণকে এত বড় দায়িত্ব দিয়ে। কিন্তু এই তরুণটিই শেষ পর্যন্ত প্রমাণ করেছে, মহারাজ দিব্যোক ভুল করেননি। রাজা রুদক হয়ে মহারাজ ভীম পর্যন্ত আমি আমার দায়িত্ব বিশ্বস্ততার সঙ্গে পালন করে আসছি। এই সামান্য চণ্ডক আমার কিছু করতে পারবে না। তবে এ-ও সত্য, সে একগুঁয়ে। জেদি। জেদের বশে কিছু করে বসে কি না, এ নিয়ে ভাবনা আমার,' বললেন বিশ্বমঙ্গল।

'পরে সময় ও সুযোগমতো বাবার সঙ্গে চণ্ডকের ব্যাপারটি নিয়ে আলোচনা করুন। আমি করতাম, কিন্তু বাবা চণ্ডক নামে অন্ধ। তা ছাড়া তার সঙ্গে আমার একপ্রকার দ্বন্দ্ব হয়ে গেছে। এ মুহূর্তে তার বিরুদ্ধে কিছু বললে বাবা ভাববেন, আমি ওই দ্বন্দ্বের জের ধরে ঈর্ষাবশত তাঁর কান ভারী করছি,' করুণ মুখে বলল শর্বদেব।

'আমি আজকেই বলতে চেয়েছিলাম মহারাজকে। তুমি নিষেধ করলে। তোমার নিষেধের যথার্থ যুক্তি আছে। যুদ্ধের আকাশ কেটে যাক। পাল বংশ নিপাত শেষে কৈবর্ত-দেশে শান্তি ফিরে আসুক। তখন চণ্ডকের মাৎস্যন্যায় আর বেশ্যাগমন সম্পর্কে মহারাজ ভীমের সঙ্গে আলোচনায় বসব। তোমাদের অনেক নুন খেয়েছি, নুনের শোধ দিতে হবে আমাকে, শোধ দিতেই হবে।' শেষের দিকে সত্তর ছুঁই ছুঁই বিশ্বমঙ্গল আবেগে আপ্লুত হয়ে পড়লেন।

শর্বদেব বলল, 'আমার বাবা বড় ভাগ্যবান। আপনার মতো বিশ্বস্ত, ন্যায়পরায়ণ অর্থমন্ত্রী পেয়েছেন; পাল বংশের আতঙ্ক মহাসমরনায়ক কঙ্কণদেবকে পেয়েছেন; মাননীয় কৃপাসিন্ধুর মতো সুপরামর্শককে পেয়েছেন। সামান্য চণ্ডক যদি বিরূপ কিছু ভাবেও বা, তাতে বাবার গায়ে আঁচড় লাগবে না। আমাদের পরিবারের এই বিশ্বাস যে, আপনারা রাজপরিবারের ঢাল। প্রবল ঝড়-ঝঞ্ঝা, প্রকট কৃতঘ্নতা আমাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না—এ কথাটা আমরা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করি।'

'এ ব্যাপারে তোমরা শতভাগ নিশ্চিত থাকতে পারো। আমরা অকৃতজ্ঞ নই, কৃতঘ্ন হওয়ার প্রশ্নই আসে না। এই প্রাণের বিনিময়ে আমরা এই দেশের স্বাধীনতা রক্ষা করব, এই দেশের সূর্য ভীম মহারাজের নিরাপত্তা বিধান করব,' আগুনঝরা কণ্ঠে কথাগুলো বলে গেলেন অর্থমন্ত্রী।

কৃতজ্ঞতা মেশানো চোখে অর্থমন্ত্রী বিশ্বমঙ্গলের দিকে তাকিয়ে থাকল শর্বদেব।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বারো

এক প্রত্যুষে পাল সৈন্যরা ঝাঁপিয়ে পড়ল বরেন্দ্রির ওপর। অশ্বখুরের আওয়াজে আওয়াজে চতুর্দিক প্রকম্পিত হলো। ফসলি মাঠ দলিত হলো। গ্রামের পর গ্রাম জ্বলল। প্রজারা অতর্কিত আক্রমণে দিশেহারা হয়ে দিগ্বিদিক ছোটাছুটি শুরু করল। পাল সৈন্যের তরবারির আঘাতে আঘাতে দ্বিখণ্ডিত হলো অনেকে। বর্শাবিদ্ধ হয়ে পলায়মান নরনারী পথিপার্শ্বে কাতরাতে লাগল।

তবে এ দলন, এ প্রজ্বলন স্বল্প সময় স্থায়ী হলো। ইতস্তত বিক্ষিপ্ত কৈবর্ত সৈন্যরা কঙ্কণের নির্দেশনায় মধ্যাহ্নের মধ্যে সংহত হয়ে ঘুরে দাঁড়াল।

ভীম সর্বাগ্রে। খাণ্ডবদাহের আগুন ভীমের মনে। মহারাজ দিব্যোককে, পিতা রুদককে স্বস্তিতে রাজত্ব করতে দেয়নি এই পালরা; তাদের রেহাই নেই। বরেন্দ্রির গ্রামে গ্রামে আগুন দিয়েছে যারা, তাদের বেঁচে থাকার অধিকার নেই; কৈবর্ত-কর্মকার-নাপিত-কুম্ভকার-ধোপা-তৈলকার-ডোম-তাম্বুলি-শৌণ্ডক—এদের নারীদের মাতৃতা হরণ করেছে যারা, তাদের রক্তে এই পবিত্র ভূমিকে স্নান করাতে হবে। অস্ত্রের আঘাতে আঘাতে ওইসব নরপশুর দেহ ভূলুণ্ঠিত করতে হবে। তাদের মৃতদেহ কৈবর্তভূমির পথে-প্রান্তরে পড়ে থাকবে। শিয়াল-কুকুর টেনে টেনে খাবে, ঝাঁকে ঝাঁকে গৃধ্র ঝাঁপিয়ে পড়বে শত্রুশবের ওপর।

ভীম হিমালয় নামের হাতির পিঠে চড়ে যুদ্ধে রত। ভীম লড়েন, সঙ্গে সঙ্গে লড়ে চণ্ডক। হাতে তির-ধনুক-বর্শা-তলোয়ার-খড়্গ নিয়ে পাল সৈন্যদলের ভেতরে ঢুকে গেল হাজার হাজার কৈবর্ত সেনা।

যুদ্ধ হচ্ছে চারণভূমিতে, তৃণপ্রান্তরে, নদীতে, নদীতটে; যুদ্ধ হচ্ছে উপত্যকায়, অরণ্যে, লোকালয়ে। পদাতিক সৈন্যদল পরিচালনা করছেন মহাসমরনায়ক কঙ্কণদেব আর নৌবাহিনীর দায়িত্ব পেয়েছে শর্বদেব। দ্রুতগতির পানসি তৈরি হয়েছে হাজারে হাজারে। সত্যব্রত রামপালকে বলেছিলেন, ভীম যুদ্ধপ্রস্তুতি সম্পন্ন করলেও একটি ক্ষেত্রে প্রস্তুতির খামতি রয়ে গেছে। আর সেটা হলো, যুদ্ধনৌকা নির্মাণ শেষ করতে পারেনি কৈবর্তরাজের কারিগরেরা। এ সংবাদটি সত্য নয়। ভীম অনুধাবন করেছিলেন,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নৌযান-প্রস্তুতি প্রকাশ্যে নিলে একসময় না একসময় তার বিবরণ রামপালের কাছে পৌঁছে যাবে। তাই ভীম কৌশল অবলম্বন করলেন। ডমরনগরঘাট থেকে পাঁচ ক্রোশ উজানে ধর্মশালা গাঁ। এই গাঁকে কারিগর গাঁ-ও বলে কৈবর্তরা। কারণ, এই গাঁয়ের অধিকাংশ লোকের পেশা নৌকানির্মাণ। ওদের কারিগর বলে সবাই। কালিন্দী থেকে বড় একটা খাল ধর্মশালা গাঁয়ের পাশ দিয়ে আরও সামনে এগিয়ে গেছে। রামপালের যুদ্ধপ্রস্তুতি শুরু করার অনেক আগেই ভীম এই গাঁয়ের কারিগরদের ছোট-বড় নানা আকারের যুদ্ধনৌকা তৈরির আদেশ দিয়ে রেখেছিলেন। এখন ভীমের নির্দেশ পেয়ে হাজার হাজার যুদ্ধনৌকা বেরিয়ে এল কালিন্দীতে। শর্বদেবের নির্দেশনা ও নেতৃত্বে কালিন্দী নদী, লৌহিত্য নদী দিয়ে দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ল কৈবর্ত সেনারা। রামপালের সৈন্যরা জলযুদ্ধে মোটেই দাঁড়াতে পারল না। অধিকাংশই অস্ত্রের আঘাতে আঘাতে জর্জরিত হলো। তরঙ্গময় কালিন্দীজলে ডুবে মরল অনেকেই। যে কজন পাল সেনা প্রাণে বাঁচল, তারা পলায়নপর কুকুরের মতো লেজ গুটিয়ে সীমান্তের ওপারে পালাল।

ভীমের নেতৃত্বে কৈবর্ত সেনারা পাল বাহিনীর মুখোমুখি। পাল বাহিনীকে নেতৃত্ব দিচ্ছে বিত্তপাল। ভীমের পেছনে হাজার হাজার কৈবর্ত সেনা। তাদের হাতে হাতে কুন্ত, শূল, তোমর, বরাহকর্ণ, কণয়, ত্রাসিকা, ভল্ল, বর্শা, ক্ষুরপ্র, অঙ্কুশ, ধাত্র, খঞ্জর, বাঘনখ, জাঠা, গদা, রণকুঠার, তির-ধনুক, ঢাল-তলোয়ার।

ভীমের পাশে পাশে চণ্ডক। মহিষারোহী সে। তার বাহনের নাম কৈলাস। কৈলাস মহাকায়, তিরের ফলার মতো তীক্ষ্ণ শিং তার। কাস্তের মতো বাঁকানো। চণ্ডকের হাতে খড়্গ। তা দিয়েই যুদ্ধ করে সে। তীক্ষ্ণধার সে খড়্গ। আঘাত করার ক্ষেত্রে যেমন এটি উপযোগী, তেমনি এর আঘাত সহ্য করার ক্ষমতাও প্রশংসনীয়। খড়্গহাতে চণ্ডক বিধ্বংসী, অপ্রতিরোধ্য। কোনো শত্রুসৈন্য তার খড়্গের আওতায় এসে প্রাণ নিয়ে ফিরে যেতে পারে না। খড়্গ চালনার নানা পদ্ধতি—ভ্রান্ত, উদ্‌ভ্রান্ত, আবিদ্ধ, আপ্লুত, বিপ্লুত, সৃতত, সম্পাত, সমূদীর্ণ, শ্যেনপাত, আকুল, উদ্ধূত, অবধূত, সব্য, দক্ষিণ, অনালক্ষিত, বিস্ফোট, কলারেন্দ্র, মহাসখ, বিকরাল, নিপাত, বিভীষণ, ভয়ানক, সমগ্র, অর্দ্ধ, তৃতীয়াংশ, পাদ, পাদার্দ্ধ, বারিজ, প্রত্যালীঢ়, ববাহ, লুলিত। সব পদ্ধতি চণ্ডকের অধিকারে। এই পদ্ধতির যেকোনো একটির প্রয়োগে সে শত্রুর স্কন্ধ থেকে মস্তক ধুলায় লুটিয়ে দেয় নিমেষেই।

দুদিন প্রচণ্ড যুদ্ধ হয় উভয় পক্ষে, নানা স্থানে, খণ্ড খণ্ডভাবে। দু-একটি স্থান

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছাড়া অধিকাংশ স্থানে পাল সৈন্যরা জয়ী হতে পারে না। কিছুক্ষণ যুদ্ধের পর পিছু হটতে বাধ্য হয় তারা। পিছু হটতে গিয়ে পথ হারায়। পথের দুধারে কৈবর্ত সেনারা ঘাপটি মেরে থাকে। অতর্কিত আক্রমণে বিধ্বস্ত হয় পলায়নপর পাল সেনারা। কৃপাসিন্ধু যথার্থ বলেছিলেন, কৈবর্তরাজ্য প্রথমে আক্রমণ করে তেমন সুবিধা করতে পারবে না রামপাল। পথঘাট, জল-হাওয়ার কথা বলেছিলেন তিনি। কার্যক্ষেত্রে কৃপাসিন্ধুর কথাই সত্য হলো। এ দেশের নদীনালা, পাহাড়-উপত্যকা, রাস্তাঘাট, গাঁ-গঞ্জের ভূগোল সম্পর্কে তেমন জানা নেই পাল সেনাদের। তাই তারা মার খেল, বিপর্যস্ত হলো কৈবর্তদের হাতে। পর্যুদস্ত সৈন্যবাহিনী দুদিন কোনোরকমে বরেন্দ্রির অভ্যন্তরে যুদ্ধ করে সীমান্তের ওপারে গিয়ে আশ্রয় নিল।

কিন্তু এই দুদিনে পাল সৈন্যরা বরেন্দ্রির অনেক ক্ষতি করে গেল। গাঁ-গেরাম পোড়াল, অরণ্য ধ্বংস করল, রাজপথ ছারখার করল, সেতু ধ্বংস করল। পাল আক্রমণে স্থানে স্থানে জনজীবন বিধ্বস্ত হলো। অনেক নারী শ্লীলতা হারাল।

ভীম মন্ত্রণাসভায় বললেন, এ রকম হতে দেওয়া যায় না। এ রকম অতর্কিত খণ্ড খণ্ড আক্রমণে বরেন্দ্রির অবস্থা কাহিল হয়ে পড়বে। গোটা দেশ যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হবে। গোটা দেশকে যুদ্ধক্ষেত্র বানাতে চান না তিনি। একদিকে যুদ্ধ চলবে, অন্যদিকে প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে রাজধানী পর্যন্ত সাধারণ জনজীবন চলবে আপন নিয়মে। যুদ্ধের আঘাত যাতে জনজীবনের স্বাচ্ছন্দ্য নষ্ট না করে, এ জন্য যুদ্ধকে একস্থানকেন্দ্রিক করতে হবে। তিনি আরও বললেন, 'রামপালের নৌসেনারা বিধ্বস্ত হয়েছে আমাদের হাতে। নৌপথে আক্রমণ করার সব শক্তি হারিয়েছে রামপাল। এখন সে তার সর্বশক্তি প্রয়োগ করবে স্থলপথে। স্থলবাহিনীকে সে আরও শক্তিশালী করবে অচিরেই। এটাই তার কৈবর্তদের বিরুদ্ধে শেষ যুদ্ধ। এ যুদ্ধে সে পরাজিত হতে চাইবে না। সে জানে, এই যুদ্ধে পরাজিত হলে পাল সাম্রাজ্যের ধ্বংস অনিবার্য। তাই সে মরণকামড় দেবে। আমি একটা নির্দিষ্ট স্থানকে যুদ্ধক্ষেত্র হিসেবে নির্বাচন করতে চাই। রামাবতি এবং ডমরনগরের মাঝখানে বিরাট বিরান একটা ক্ষেত্র আছে। অফলা—এ স্থানের নাম। এখানকার মাটি শক্ত ও রুক্ষ। অনুর্বর। এ জন্য মানুষ এ স্থানের নাম দিয়েছে অফলা। ওখানে সমতলভূমি যেমন আছে, আবার তার অন্যদিকে আছে ছোট ছোট টিলা। ওই অফলাই হবে আমাদের যুদ্ধক্ষেত্র। ওখানেই কৈবর্ত সৈন্যসমাবেশের নির্দেশ দিচ্ছি আমি। টিলার দিকে অবস্থান নেবে আমাদের বাহিনী। আমরা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

টিলার দিকে অবস্থান নিলে বাধ্য হয়ে পাল বাহিনী অবস্থান নেবে সমতলে। উঁচু স্থান থেকে আক্রমণের সুবিধা আছে। সমূলে ধ্বংস হবে পাল বাহিনী, নিপাত যাবে রামপাল।' অনেক কথা বলে দম নেওয়ার জন্য একটু থামলেন মহারাজ ভীম।

তারপর উপস্থিত মন্ত্রক ও সমরনায়কদের উদ্দেশে বললেন, 'তাই বলে ছোট ছোট আক্রমণ থেকে বিরত থাকবে না রামপাল। হিংস্র, দ্রুতগামী ও অতর্কিত আক্রমণে দক্ষ ছোট ছোট সৈন্যদল পাঠাবে সে বরেন্দ্রিতে। এই আক্রমণ ঠেকাতে হবে। বিনাশ করতে হবে আক্রমণকারীদের। আমাদের চৌকস সৈন্যরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হয়ে এদের মোকাবিলা করবে। কিন্তু আমাদের মূল যুদ্ধ হবে অফলায়।'

কিন্তু ভীমের সন্দেহ সত্য হলো না। হঠাৎ রামপাল আক্রমণ থামিয়ে দিল। বড় আক্রমণ তো করলই না, ছোট ছোট আক্রমণ থেকেও বিরত থাকল পাল বাহিনী। পাল-আক্রমণ বন্ধ হয়ে যাওয়ার পেছনে কোনো দুরভিসন্ধি আছে কি না, তা মহারাজ ভীম বুঝতে পারলেন না। তিনি অস্থির হয়ে উঠলেন। গুপ্তচরপ্রধান কৃপাসিন্ধুকে অনুসন্ধান করতে বললেন। দিন দুয়েকের মধ্যে কৃপাসিন্ধু খবর আনলেন, দুদিনের যুদ্ধে পাল বাহিনীর বিপুল ক্ষতিসাধিত হয়েছে। বিশেষ করে, নৌবাহিনী সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত। অধিকাংশ রণতরি ও যুদ্ধাস্ত্র ফেলে তারা কালিন্দী আর লৌহিতা থেকে পালিয়েছে। রামপাল চৌদ্দ জন সামন্ত নিয়ে মন্ত্রণায় বসেছেন, মন্ত্রণা চলছে কয়েক দিন ধরে। মনে হচ্ছে, বড় যুদ্ধের পরিকল্পনা নিয়ে পরামর্শ করছেন রামপাল।

'এখন কী করা উচিত বলে তুমি মনে করো,' ভীম বললেন।

'আমাদের মরণপণ যুদ্ধ-প্রস্তুতির এটাই সময়। রামপাল মস্তবড় ভুল করলেন,' কৃপাসিন্ধু বললেন।

'ভুল করল?'

কৃপাসিন্ধু বললেন, 'হ্যাঁ, মহারাজ। ছোট ছোট আক্রমণ থেকে বিরত থেকে রামপাল ভুল করেছেন। আক্রমণ চলতে থাকলে আমরা ব্যতিব্যস্ত থাকতাম। জনজীবন অস্থির হতো। আপনি বিচলিত থাকতেন। অল্প পরিমাণ হলেও এ দেশের ক্ষতি হতে থাকত। আক্রমণের কারণে আমরা সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারতাম না। রামপাল আক্রমণ বন্ধ রেখে আমাদের ভাবার সুযোগ করে দিলেন। এই যেমন আপনি সিদ্ধান্ত দিলেন, অফলাতেই মুখোমুখি যুদ্ধ হবে। আর দুদিনের আক্রমণে আমাদের যা ক্ষতি হয়েছে, তা পুষিয়ে নিতে পারব।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'তুমি যথার্থ বলেছ, কৃপাসিন্ধু। তাই বলে তুমি হাত গুটিয়ে বসে থেকো না। তোমার গুপ্তচর বাহিনীকে সতর্ক ও সক্রিয় রাখবে,' ভীম বললেন।

পরদিন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হয়ে কৈবর্ত বাহিনী অফলার দিকে যাত্রা করল। আর দিনান্তের রাতে চণ্ডক রওনা দিল বারাঙ্গনাপল্লির দিকে। একাই গেল সে মোহনার কাছে। এখন দেশে যুদ্ধাবস্থা। নিরাপত্তার খাতিরে রাজপুরুষদের একাকী ভ্রমণ নিষিদ্ধ। চণ্ডক সে নিষেধ মানল না। তবে ছদ্ম পোশাকের আড়ালে নিজেকে ঢেকে চণ্ডক উপস্থিত হলো মোহনার দরজায়।

মোহনা তখন গৃহাভ্যন্তরে। শয্যার ওপর এলোচুলে বসা। পাশে সেই বঁটিটি, মানে তার স্বামী। চণ্ডক তার কুমারিত্ব কেড়ে নেওয়ার আগের গোধূলিতে বামুনঠাকুর যার সঙ্গে বিয়ে দিয়েছিল, জানকি বলেছিল—ইটিই তোর স্বামীরে, বিটি, সেই বঁটির গায়ে অন্যমনস্কভাবে হাত বোলাচ্ছিল। আজ সন্ধ্যায় হঠাৎ মনে পড়েছিল বঁটিটির কথা। সিন্দুকেই বন্দী ছিল এটি এত দিন। ওটা বের করে পরিষ্কার কাপড় দিয়ে অতি যত্নে বার কয়েক মুছেছিল মোহনা। তারপর শয্যার মাঝখানে বসে তার গায়ে আলতো হাত বোলাচ্ছিল। স্বামীর গায়ে হাত বোলাতে বোলাতে মোহনা ভাবছিল চণ্ডকের কথা। ধনারাম খবর এনেছে, দেশে যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। দলে দলে পাল সৈন্য বরেন্দ্রি আক্রমণ করেছে। রাজপুত্র শর্বদেব নাকি রামপালের কোমর ভেঙে দিয়েছে। ওদের যুদ্ধতরিগুলো কালিন্দীজলে চুবিয়েছে নাকি আমাদের সেনারা। মোহনা আগ্রহভরে চণ্ডকের কথা জানতে চেয়েছে। অভ্যাসবশত ধনারাম নানা ভূমিকা করেছে। মোহনার কঠোর ধমক খেয়ে ধনারাম বলেছে, 'কী বলবু, দিদি, তোমার চণ্ডকদেব নাকি পালদের মুণ্ড নামিয়েছে হাজারে হাজারে। যুদ্ধক্ষেত্রে সে কী দাপট তার! একেকটা কোপে একেকটা মাথা ধুলায় পড়িছে নাকি!'

কেমন আছে চণ্ডক, জানতে চেয়েছে মোহনা। 'খুব ভালো আছে, বড় ভালো আছে নাকি শুনিছি।' উচ্ছ্বাসের সঙ্গে বলেছে ধনারাম।

বিছানায় বসে বসে মোহনা ভাবছে—ও ভালো থাকলে কী হবে, আমি তো ভালো নেই। আমি যে ভালো নেই, সে খোঁজ কি সে নিচ্ছে? বিবেক বলছে—চণ্ডক এখন তোমার খবর নেবে কী করে? দেশে এখন যুদ্ধ চলছে না! তুমি তো জানো—চণ্ডক একজন দক্ষ শক্তিমান সমরনায়ক। তার তো এখন মহারাজ ভীমের কাছে থাকা চাই। এ সময় তোমার কাছে আসবে কী করে চণ্ডক? মোহনা ভাবছে—তা তো আমি বুঝি। কিন্তু মনকে তো বোঝাতে পারছি না। মন চাইছে চণ্ডকের সান্নিধ্য। যা-ই হোক আর তা-ই হোক, তাকে আমার চাই-ই চাই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এ সময় দরজার বাইরে শোনা গেল : 'কপাট খোলো গো, দিদি।'

অন্যমনস্ক মোহনা জিজ্ঞেস করল, 'কে?'

'আমি গো দিদি, আমি, ধনারাম।'

'কী রে ধনা, কী হয়েছে?'

দরজার কাছে মুখ এনে নিচু স্বরে আবেগপ্রবণ কণ্ঠে ধনারাম বলল, 'আসিছে গো, দিদি, তোমার পুরুষ আসিছে।'

'কী বললি' বলে ঝট করে কপাট খুলল মোহনা। সামনে চণ্ডককে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে অবাক কণ্ঠে বলল, 'তুমি? এ সময়ে? না বলে?'

চণ্ডক স্থির চোখে তাকিয়ে থাকল মোহনার দিকে। তারপর মাথা নিচু করে ধীর পায়ে ঘরে ঢুকল। কুরসিতে বসে ম্লান কণ্ঠে বলল, 'হ্যাঁ, আমি। রাতেই তো আসি আমি তোমার কাছে।' এক মুহূর্ত চুপচাপ কী যেন ভাবল চণ্ডক। তারপর করুণ চোখে মোহনার দিকে তাকিয়ে বলল, 'বলে আসার অধিকার যে আমি হারিয়েছি, মোহনা।'

অবাক চোখে মোহনা বলল, 'অধিকার হারিয়েছ মানে?'

'আমি ব্যর্থ, মোহনা, আমি পরাজিত,' ভাঙাচোরা কণ্ঠে বলে উঠল চণ্ডক। ব্যর্থ, পরাজিত—এসব কথার মর্মার্থ বুঝতে পারল না মোহনা। সে তো শুনেছে—যুদ্ধক্ষেত্রে বিপুল বীরত্বে যুদ্ধ করেছে চণ্ডক। অনেকানেক আক্রমণকারীকে কচুকাটা করেছে সে। শুনেছে, ভীমবাহিনী পরাক্রমের সঙ্গে যুদ্ধ করে পাল বাহিনীকে খেদিয়ে দিয়েছে সীমান্তের ওপারে। তাহলে ব্যর্থতা কিসের? পরাজয়ের কথাই বা কেন বলছে সে?

মোহনা বলল, 'পরাজয়! কিসের পরাজয়? ভীমবাহিনী তো জয়ী হয়েছে শুনেছি।'

চণ্ডক শ্লথ কণ্ঠে বলল, 'ভীমের পরাজয় নয়, মোহনা, আমি আমার পরাজয়ের কথা বলছি।'

'তোমার পরাজয়? আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। খুলে বলো তুমি,' চণ্ডকের ঘনিষ্ঠ হয়ে কথাগুলো বলল মোহনা।

'সবকিছু জানতে চেয়ো না। শুধু এটুকু জেনে রাখো—তোমার স্বপ্নপূরণ করতে পারলাম না আমি,' চণ্ডক বলল।

মোহনা চণ্ডকের প্রতিশ্রুতির কথা ভুলে গেছে। বাহারি বজরায় করে গাঙ্গীর পশুপাখি, গাছগাছালির সান্নিধ্য লাভ, বালিকা বয়সের খেলার সাথিদের সন্ধান করা—এসব স্বপ্ন ও রাতেই ফুরিয়ে গেছে। মোহনা জানে, স্বপ্ন দেখানো রাজপুত্রদের খেলা। ভাবে পড়ে ওইসব স্বপ্নের কথা বলেছিল সে রাতে চণ্ডক।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাত গেছে তো স্বপ্ন গেছে। ওসব তো মনে রাখেনি মোহনা! অলীক স্বপ্নের ব্যাপার নিয়ে চণ্ডকের তো ভেঙে পড়ার কথা নয়! তাহলে কি চণ্ডক সে রাতে তাকে শুধু শুধু স্বপ্ন দেখায়নি! সত্যি সত্যি বলেছিল—বজরা বানাবে, বজরা কালিন্দীতে ভাসবে, ফুরফুরে বাতাসে উড়বে তার আঁচল। হয়তো তা-ই, হয়তো নয়। সাধারণ একজন বেশ্যার মনোরঞ্জনের জন্য, মনোবাসনা পূরণের জন্য চণ্ডকের মতো মানুষের মন খারাপ করার কোনো যুক্তি নেই।

সান্ত্বনার স্বরে মোহনা বলল, 'স্বপ্ন পূরণটুরন বুঝি না। এত দিন পরে এলে, এতেই আমার সুখের অন্ত নেই।' নিজের বসন দিয়ে চণ্ডকের মুখমণ্ডলের স্বেদবিন্দু পরম যত্নে মুছিয়ে দিল মোহনা। তারপর বলল, 'কত বড় যুদ্ধ গেল! শুনেছি, অনেকে প্রাণ হারিয়েছে এই যুদ্ধে। তুমি আমার কাছে অক্ষত দেহে ফিরে এসেছ, এ জন্য কন্দর্পদেবের কাছে লক্ষ-কোটি প্রণাম।'

'তুমি আমাকে কথায় ভুলিয়ো না, মোহনা। তোমাকে আসল কথা শুনতে হবে।' তারপর হঠাৎ রেগে গেল চণ্ডক। উচ্চকণ্ঠে বলে উঠল, 'আমি তোকে দেখে নেব, বিল্বমঙ্গল।'

মোহনা ভয় পেয়ে গেল। হঠাৎ এ রকম উচ্চস্বরে চিৎকার দিয়ে উঠল কেন চণ্ডক? তাও আবার বরেন্দ্রির অর্থমন্ত্রী বিল্বমঙ্গলের বিরুদ্ধে! অশুভ চিন্তায় মোহনার বুক কেঁপে উঠল। বলল, 'বুঝি শান্ত হও, শান্ত হও তুমি। এ রকম করছ কেন তুমি?'

চণ্ডক অকস্মাৎ যেভাবে উগ্র হয়ে উঠেছিল, ঠিক তেমনিভাবে হঠাৎ শান্ত হয়ে গেল। বলল, 'আমি তোমাকে বজরা বানিয়ে দিতে পারলাম না, মোহনা। তবে এটা সত্যি যে, একসময় না একসময় তোমার জন্য, কেবল তোমারই জন্য কালিন্দীতে বাহারি বজরা ভাসবে। যুদ্ধ থামুক। তারপর আমি দেখে নেব সব শ্যালককে।'

হঠাৎ কুলকুল করে হেসে উঠল মোহনা। হাসতে হাসতে চণ্ডকের বুকে ঢলে পড়ল। দমফাটা হাসিকে থামাতে চেষ্টা করতে করতে মোহনা বলল, 'শ্যালক! শ্যালক পেলে কোথায় তুমি?' তারপর চণ্ডকের চিবুক নাড়তে নাড়তে বলল, 'মোহনাকে ফাঁকি দিয়ে বিয়ে করে ফেলেছ নাকি তুমি?'

'না, মানে। মানে।' আমতা আমতা করে কী যেন বলতে চাইল চণ্ডক।

মোহনা চণ্ডকের গালে গলায় ঠোঁট ঘষতে ঘষতে বলল, 'আর মানে মানে করতে হবে না নটবর। ওসব স্বপ্ন-স্বপ্নভঙ্গ, পরাজয়-ব্যর্থতার কথা এখন বন্ধ। বলো, আমাকে ছাড়া কেমন ছিলে এত দিন? মনে পড়েনি আমার কথা?'

চণ্ডক মোহনার কথার কোনো জবাব দিল না। শুধু নিবিড় করে মোহনাকে নিজের দিকে টেনে নিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তেরো

অফলায় দুটো বাহিনী মুখোমুখি অবস্থান নিয়েছে। দুই বাহিনীর মাঝখানে বিশাল রুক্ষ ভূমি। কঙ্কণদেবের ভীমবাহিনী টিলার দিকে অবস্থান নেওয়ায় সুবিধাজনক অবস্থায় আছে। রামপাল আর তাঁর প্রধান সমরনায়ক এটাকে সুবিধাজনক অবস্থান বলে মানতে নারাজ। ভীমবাহিনীর চারদিকে চৌকস পাল সৈন্য দিয়ে চক্রব্যূহ রচনা করেছেন বিশুদ্ধানন্দ। চক্রব্যূহের পেছনে প্রধান সেনাপতির তাঁবু। তাঁকে ঘিরে ছোট-বড় সমরনায়কদের অবস্থান। সবার পশ্চাতে রামপালের তাঁবু। তার দুপাশে বিত্তপাল আর মথনদেবের শিবির।

আর ওদিকে তিন সারি সৈন্যের পেছনে মহারাজ ভীম অবস্থান নিয়েছেন। তাঁর দুপাশে চণ্ডক আর শর্বদেবের অবস্থান। সৈন্যদের ঠিক মাঝখানে তাঁবু ফেলেছেন প্রধান সমরনায়ক কঙ্কণদেব। ছোট ছোট সৈন্যদল নিয়ে টিলার এখানে-ওখানে ছোট-মাঝারি সমরনায়কেরা সতর্ক অবস্থান নিয়েছে।

যুদ্ধ চলছে দুদিন ধরে। দিনের বেলায় যুদ্ধ, রাতের বেলায় যুদ্ধবিরতি—এটাই স্থলযুদ্ধের নিয়ম। অফলার উন্মুক্ত ভূমিতে যুদ্ধ চলছে দুদিন ধরে। রক্তক্ষয়ী, জীবনবিধ্বংসী যুদ্ধ। ভোরসকাল থেকে সূর্য ডোবা পর্যন্ত অস্ত্র আর শস্ত্রের ঝনঝনানি আর হাহাকার-হুংকারে অফলার আকাশ-বাতাস প্রকম্পিত। দুদিনের যুদ্ধে পালদেরই ক্ষতি হয়েছে বেশি। অফলার এধারে-ওধারে মৃতদেহ পড়ে থেকেছে। সেই মৃতদেহ ঘিরে রাতজুড়ে চলেছে শিয়াল-কুকুরের ভক্ষণ-উৎসব।

মথনদেব রামপালের উদ্দেশে বললেন, 'ভাগিনেয়, গত দুদিনের যুদ্ধ-পরিস্থিতি দেখে মনে হচ্ছে, ভীমবাহিনীর সামনে আমরা নড়বড়ে।'

'হতোদ্যম হলে চলবে না, মাতুল। এ যুদ্ধে জয়লাভ আমাকে করতেই হবে।'

'দেখে তো মনে হচ্ছে, এই যুদ্ধে তুমি সহজে জয় পাবে না।'

'কেন জয় পাব না? আপনি এত অভিজ্ঞ, মাতুল! আপনি মাত্র দুদিনের যুদ্ধ দেখে ভয় পেয়ে গেলেন?'

'ভয় পাওয়ার লোক আমি নই। গত দুদিনের যুদ্ধ-পরিস্থিতি তুমি লক্ষ করেছ, রামপাল? তেমন করে করোনি। যদি করতে তাহলে দেখতে পেতে...।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'কী দেখতে পেতাম?' মথনদেবের মুখের কথা কেড়ে নিয়ে রামপাল জিজ্ঞেস করলেন।

মথনদেব রামপালের প্রশ্নের সরাসরি কোনো উত্তর না দিয়ে বলতে লাগলেন, 'আমি লক্ষ করেছি সামন্তদের কাছ থেকে ধার করা সৈন্যরা তেমন করে যুদ্ধ করছে না, যেমন করে করছে তোমার নিয়মিত বাহিনী। কী রকম একটা গা-ছাড়া ভাব লক্ষ করছি আমি ওইসব সৈন্যের মধ্যে। আজকে তো সামন্ত জয়সিংহের সৈন্যদলকে যুদ্ধক্ষেত্রের একপাশে নিষ্ক্রিয় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম।'

'এসব আপনি কী বলছেন, মাতুল?' রামপাল অবাক কণ্ঠে জিজ্ঞেস করেন।

'যা সত্য তা-ই বলছি তোমাকে। জয়সিংহের সৈন্যদের দেখাদেখি অন্যান্য সামন্ত সৈন্যও সুযোগ নেবে।'

'তাহলে উপায়, মাতুল?'

'গত দুদিনের যুদ্ধাভিজ্ঞতায় আমার মনে হলো, তোমার সৈন্যবাহিনী শেষ পর্যন্ত কৈবর্ত বাহিনীর সামনে টিকে থাকতে পারবে না।'

'উপায় বলুন, মাতুল, উপায় বলুন। আমাকে আর অস্থিরতার মধ্যে ফেলবেন না।'

মথনদেব, রামপালের মাতুল, রামপালের কানের কাছে মুখ এনে বললেন, 'বশ করো।'

'কাকে বশ করব?' বিস্মিত রামপাল।

'ভীমের ডান হাতকে।'

'ভীমের ডান হাত আবার কে?'

মথনদেব এবার ফিসফিস করে বললেন, 'ভীমের ডান হাত হলো চণ্ডক। তাকে দলে টানো, ভাগিনেয়।'

'আপনি কি উন্মাদ হয়ে গেলেন, মাতুল? চণ্ডক ভীমের পুত্র। ভীমের জন্য চণ্ডক প্রাণ দিতে প্রস্তুত। আর আপনি বলছেন তাকে দলে টানতে!' রামপালের কণ্ঠে উপহাসের আভাস।

মথনদেব ভাগিনার কথায় বিচলিত হলেন না। শান্ত কণ্ঠে বললেন, 'পালিত পুত্র, চণ্ডক ভীমের পালিত পুত্র। আর হ্যাঁ, আমি পাগল হইনি। তোমার যুদ্ধজয়ের একমাত্র উপায় চণ্ডকের কৃতঘ্নতা।'

রামপাল জোর গলায় বললেন, 'চণ্ডক কখনো কৃতঘ্ন হবে না।'

'হবে। চণ্ডকের শিরায় শিরায় পালদের রক্ত। রক্তের দাবিকে সে কখনো অস্বীকার করতে পারবে না।' আস্থার স্বর মথনদেবের গলায়।

'মানে? চণ্ডকের শিরায় পালদের রক্ত, এ কথার অর্থ কী? কিছুই তো বুঝছি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

না, মাতুল!'

'বিস্তৃতভাবে বলার সময় এটা নয়, রামপাল। যা বলছি, তা-ই করো। চণ্ডককে বিভীষণ বানাও। দলে টানো তাকে,' বললেন মথনদেব।

'কৃতঘ্ন হবে না চণ্ডক। কিছুতেই সে বিশ্বাসঘাতকতা করার জন্য রাজি হবে না।'

মথনদেব রামপালকে বললেন, 'কড়ির লোভ দেখাও, স্বর্ণমুদ্রার লোভ দেখাও, অপরিমিত ভূমির লোভ দেখাও। শুনেছি নারীলোভী সে, কামান্ধ। বারাঙ্গনাপল্লিতে যাতায়াত করে সে। তাকে সুন্দরী নারীর লোভ দেখাও।' চিবুক চুলকাতে চুলকাতে মথনদেব আরও বললেন, 'তাতেও যদি কাজ না হয়, তাহলে অন্য কিছুর লোভ দেখাও।'

'অন্য কিছুর মানে?'

মথনদেব তাঁর আসনটি রামপালের আরও কাছে টেনে নিলেন। তারপর অস্ফুট স্বরে কিছু কথা বলে গেলেন তিনি। কথা শেষ হলে প্রশংসিত দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে থাকলেন রামপাল।

রামপাল বরেন্দ্রিকে কৈবর্তশাসনমুক্ত করার শপথ নিয়েছেন। পিতামহ নয়পালের সময়ে, পিতা বিগ্রহপালের সময়ে চালুক্যরাজ বিক্রমাদিত্য বারবার এই দেশ আক্রমণ করেছেন। সে ছিল বহিরাক্রমণ। ভেতর থেকে আক্রমণের জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিলেন না পাল রাজারা। পাল শাসকেরা বিলাসে-ব্যসনে ভেসে গিয়েছিলেন। তাঁদের শাসনে দুর্বলতা ছিল। প্রজারা উত্যক্ত হতো পাল রাজন্যদের দ্বারা। প্রজাদের মধ্যে একটা প্রবল অসন্তুষ্টি তৈরি হয়েছিল পাল রাজাদের বিরুদ্ধে। এই সুযোগটাই নিয়েছিলেন পালদের এককালের সুহৃদ দিব্যোক। কৈবর্ত দিব্যোকের সমর্থক অগণন সাধারণ কৈবর্ত। তারা শক্তিশালী, সাহস আছে তাদের। যুদ্ধ জানে তারা। ব্যাঙের ছাতার মতো হঠাৎ গজিয়ে ওঠা এই মেছো জাতটাকে ধ্বংস করতেই হবে। এই জাতটাকে নির্মূল না করলে ভবিষ্যতে পালরা আর এই বরেন্দ্রিতে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে না। অশিক্ষিত-গোঁয়ার-বর্বর এই জাতটার পদানত হয়ে থাকতে হবে চিরকাল। ভীমের ধ্বংস চাই সবংশে, যেকোনো কিছুর বিনিময়ে।

গুপ্তচর অনোমদর্শীকে ডেকে পাঠালেন রামপাল। বললেন, চণ্ডককে চাই, যেকোনো মূল্যে।

অফলাতে চণ্ডকের সঙ্গে মিলিত হওয়া কিছুতেই সম্ভব নয়। কৈবর্তশিবিরের চারদিকে সতর্ক প্রহরা। সেই প্রহরা ভেদ করে চণ্ডকের কাছাকাছি যাওয়া

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অসম্ভব। অনোমদর্শীকে বলা হয়েছে, চণ্ডক বেশ্যাগামী। ডমরনগরের বারাঙ্গনাপল্লিতে মোহনা বলে এক গণিকা আছে। তার ঘরে যাতায়াত আছে চণ্ডকের। তার সঙ্গে সাক্ষাৎ যদি করতেই হয়, তাহলে ওই বারাঙ্গনাপল্লিতেই তা করতে হবে। সুযোগ ও সময়ের অপেক্ষায় থাকে গুপ্তচর অনোমদর্শী।

এরপর উভয় পক্ষের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ হয়, পাঁচ দিন ধরে। রক্তে ভেসে যায় অফলার রুক্ষ ভূমি। আকাশে ঝাঁকে ঝাঁকে শকুন উড়তে থাকে, কাকের মেলা বসে অফলাকে ঘিরে। সেদিন পাল বাহিনী প্রায় পর্যুদস্ত হয় ভীম বাহিনীর হাতে। সেদিনই চণ্ডকের খড়্গাঘাতে সর্বাধিক পাল সৈন্য নিহত হয়। দিনান্তে যুদ্ধ শেষ হয়। উৎফুল্ল মনে ক্লান্ত দেহে তাঁবুতে ফিরে আসে চণ্ডক। স্নান শেষ করতে করতে সন্ধ্যা গড়িয়ে যায়। হঠাৎ চণ্ডকের চোখে মোহনার চেহারা ভেসে ওঠে। চঞ্চল হয়ে ওঠে তার দেহ-মন। সে ঠিক করে, মোহনার কাছে যাবে।

রাত একটু গভীর হলে ভীমের চোখকে ফাঁকি দিয়ে ঘোড়া ছোটায় চণ্ডক বারাঙ্গনাপল্লির মোহনার উদ্দেশে। পেছনে পেছনে যায় তার দেহরক্ষীরা।

ভীমের চোখকে ফাঁকি দিতে পারলেও অনোমদর্শীর সতর্ক চোখকে ফাঁকি দিতে পারে না চণ্ডক। তার পিছু নেয় অনোমদর্শী।

চণ্ডক আজ রাতে তার ঘরে আসবে, সেটা মোহনা জানত না। তার পরও কেন জানি সে রাতে মোহনা নিজেকে অপূর্ব সাজে সাজিয়েছিল। সাজটা অসাধারণই ছিল, নইলে কেন সে রাতে চণ্ডক মোহনাকে দেখে অবাক হবে?

লৌহিতা নদীর পাড়ে তন্তুবায়দের গাঁ। সেখানে তৈরি হয় উৎকৃষ্ট রেশমি শাড়ি। হলুদ রঙের রেশমি শাড়ি পরেছিল মোহনা সে রাতে। কপালে হলুদ টিপ। কোঁকড়ানো চুলে হলুদ ফিতা। দুহাতজুড়ে লাল-নীল-হলুদ রঙের চুড়ি। চণ্ডক ঘরে ঢুকেই বাক্যহারা। অনেকক্ষণ পরে বলে, 'তুমি এত সুন্দরী! আগে তো এমন করে খেয়াল করিনি মোহনা।' দুহাত বাড়িয়ে মোহনাকে বুকে টেনে নেয় চণ্ডক।

ঘরের বাইরে দেহরক্ষী দল অবস্থান নিয়েছে। সতর্ক চোখ-কান তাদের। ডমরনগরের মূল্যবান মানুষ চণ্ডক, ভীমের প্রিয়ভাজন। যুদ্ধের অপ্রতিদ্বন্দ্বী নায়ক সে, অপ্রতিরোধ্য তার খড়্গাঘাত। ভীমের সমরনায়কদের মধ্যে সবচেয়ে বিচক্ষণ ও দুর্ধর্ষ সে। একাই যুদ্ধের মোড় ঘুরিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা রাখে। এ রকম গুরুত্বপূর্ণ যোদ্ধার নিরাপত্তা বিধান করা তো চাই-ই চাই। সে যেখানেই থাকুক না কেন, তার নিরাপত্তা জরুরি। এ জন্য দেহরক্ষীরা সর্বদা তাকে অনুসরণ করে। হুঁশিয়ার থাকে, যাতে কোনোভাবেই তার নিরাপত্তায় বিঘ্ন না

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঘটে। অনোমদর্শী দেহরক্ষীদের চোখকে ফাঁকি দিতে পারল না। পেছনে কঠোর কণ্ঠে আওয়াজ উঠল, 'কে, কে ওখানে ঘাপটি মেরে দাঁড়িয়ে আছ?'

অনোমদর্শী দেহরক্ষীপ্রধানের সামনে এগিয়ে এল। দেহরক্ষীপ্রধান চাপা স্বরে গর্জন করে উঠল, 'কে তুমি? এই ঘোর আঁধারে সামনের দিকে চুপে চুপে এগিয়ে যাচ্ছিলে কেন?'

'আমি সংবাদবাহক,' আস্থার স্বরে বলল অনোমদর্শী। সে যে বৌদ্ধ, রামপালের গুপ্তচর, তা তার কথার ভঙ্গিতে আর সাজে টের পাওয়ার কোনোই উপায় নেই। নিপুণ হাতে অনোমদর্শী নিজেকে কৈবর্তসাজে সাজিয়েছে। নম্রকণ্ঠে অনোমদর্শী আরও বলল, 'বরেন্দ্রি সূর্য ভীমের কাছ থেকে এসেছি। সেনাপতির সঙ্গে সাক্ষাৎ প্রয়োজন। সংবাদ আছে।'

সন্দিগ্ধ চোখ দেহরক্ষীপ্রধানের। অনোমদর্শীকে বিশ্বাস হচ্ছে না তার। জিজ্ঞেস করে, 'সমরনায়ক চণ্ডক যে এখানে, তুমি জানলে কী করে?'

'আপনিই অনুধাবন করুন দেহরক্ষীপ্রধান, না জানলে এলাম কী করে এখানে? মহারাজ ভীম বলে না দিলে বাপের সাধ্য আছে জানার!' হৃৎকম্পন দমন করে বিনীত কণ্ঠে বলল অনোমদর্শী।

দেহরক্ষীপ্রধানের চোখ কুঁচকে গেল, কপালে ভাঁজ পড়ল। বলল, 'সমরনায়ক যে বারাঙ্গনাপল্লিতে এসেছেন, তা তো মহারাজ ভীমের জানার কথা নয়।'

অনোমদর্শী ফাঁপরে পড়ে গেল। বাঁসে হৃৎপিণ্ড লাফাতে শুরু করল তার। হঠাৎ তার মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল। নির্ভীক কণ্ঠে বলল, 'আপনি হয়তো ভাবছেন, মহারাজ জানেন না। কিন্তু তিনি তো বরেন্দ্রি সূর্য, তার চোখ সর্বত্র। একে তো দুর্ধর্ষ যোদ্ধা, তার ওপর পুত্র—সুতরাং চণ্ডকদেবের গতিবিধির ওপর মহারাজ ভীমের সতর্ক নজর থাকা কি স্বাভাবিক নয়? যদি ব্যাপারটাকে স্বাভাবিক মনে করেন, তাহলে জরুরি বার্তা প্রেরণের জন্য এখানে, এই বারাঙ্গনাপল্লিতে আমাকে পাঠানোও কি স্বাভাবিক নয়?'

যুক্তির মারপ্যাঁচে দেহরক্ষীপ্রধান থতমত খেয়ে গেল। অনোমদর্শীর দিকে তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে থাকল কিছুক্ষণ। তারপর টেনে নিয়ে গেল উজ্জ্বল আলোর দিকে। ভালো করে পরখ করে নিল আগন্তুককে। বলল, 'তোমার নাম কী?' কিছুতেই সন্দেহ ঘোচে না দেহরক্ষীপ্রধানের মন থেকে।

'হরিলাল, হরিলাল আমার নাম,' অলক্ষে বড় একটা ঢোঁক গিলে অনোমদর্শী বলে।

হঠাৎ হা হা করে হেসে ওঠে দেহরক্ষীপ্রধান। পরে সংযত হয়ে বলে, 'সুখলালের ভাই হরিলাল। বাহ্! মন্দ নয়।' অনোমদর্শী দেহরক্ষীপ্রধানের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কথার কোনো অর্থ বুঝল না। বোকা বোকা চেহারা করে তাকিয়ে থাকল। চোখের ইশারায় একজন সৈনিককে অনোমদর্শীর দেহ তল্লাশি করতে বলল দেহরক্ষীপ্রধান। কোমরে, পিঠে, বুকে, পায়ে হাতড়িয়ে সৈনিকটি ডানে-বাঁয়ে মাথা নাড়ল। দেহরক্ষীপ্রধান বুঝল, হরিলাল নিরস্ত্র।

দেহরক্ষীপ্রধান অনোমদর্শীকে উদ্দেশ করে বলল, 'অপেক্ষা করো।' বলে সে মোহনার দরজার দিকে এগিয়ে গেল।

রতিক্লান্ত চণ্ডক বিশাল শয্যায় শুয়ে আছে। বিবস্ত্র। ধীবরকন্যা মোহনা আজ ভীষণ তৃপ্তি দিয়েছে তাকে। মোহনার অতলে চণ্ডক আগেও ডুব দিয়েছে বহুবার, কিন্তু আজকের সুখ স্বতন্ত্র। পাশে মোহনাও অনাবৃত। সুডৌল স্তন নিয়ে চিত হয়ে শুয়ে আছে সে। মুগ্ধ চোখে তার শরীরের দিকে তাকিয়ে আছে চণ্ডক। ভাবছে—মোহনা, তুমি আমার। শুধুই আমার। আমি ছাড়া আর কারও নও তুমি।

টুক টুক টুক—দরজায় আওয়াজ।

'কে?' বিরক্ত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করে চণ্ডক।

'আমি, সেনানায়ক। সুখলাল—আপনার দেহরক্ষীপ্রধান।'

'সুখলাল! তুমি এখানে কী করছ?' শরীরে পরিধেয় জড়াতে জড়াতে চণ্ডক গলা উঁচিয়ে বলল। একটু পরে কপাট খুলে সুখলালের সামনে দাঁড়াল সে।

সুখলাল বলল, 'একটু দরকার ছিল, সেনাপতি। একজন আপনার সাথে দেখা করতে চায়। বলছে—মহারাজ ভীমের কাছ থেকে নাকি সংবাদ নিয়ে এসেছে সে।'

'মহারাজ ভীমের কাছ থেকে? মহারাজ জানলেন কী করে আমার এখানে আসার কথা!' বিস্মিত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল চণ্ডক।

সুখলাল বলল, 'তাকে জেরা করে বুঝেছি, সে সত্যিই মহারাজ ভীমের কাছ থেকে এসেছে। তার দেহ তল্লাশি করে কিছুই পাইনি। আপনি অনুমতি দিলে তাকে নিয়ে আসতে পারি।'

চণ্ডক চিন্তিত মুখে কী যেন ভাবল। মোহনার কাছে আসার কথা মহারাজ ভীমের তো জানার কথা নয়! অতি সতর্কতার সঙ্গে তাঁর চোখকে ফাঁকি দিয়ে তো আমি এখানে এসেছি। তাহলে? একটু মুচকি হাসল চণ্ডক। বিড়বিড় করে বলল, 'যেখানে দেহরক্ষীদের চোখকে ফাঁকি দিতে পারিনি, সেখানে মহারাজ ভীম! সর্বনাশ হয়ে গেল আমার! না জানি মহারাজ আমাকে কী মনে করেন! যা হবে তা পরে হবে। বর্তমানের সমস্যা মেটানো যাক আগে।'

তারপর স্পষ্ট করে চণ্ডক বলল, 'যাও, নিয়ে আসো আগন্তুককে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অনুমতি পেয়ে সুখলাল অনোমদর্শীকে নিয়ে এল চণ্ডকের সামনে। সন্দেহের চোখে চণ্ডক অনোমদর্শীর দিকে তাকিয়ে থাকল। সুখলালকে ইশারায় স্থান ত্যাগ করতে বলল। পাশের একটি খোলা জায়গায় অনোমদর্শীকে নিয়ে এল সে।

কঠোর কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, 'সুখলালের চোখকে ফাঁকি দিতে পেরেছ তুমি, আমার চোখকে ফাঁকি দেওয়া সম্ভব নয়। বলো, কে তুমি? কী জন্য এসেছ?'

কোনো ভূমিকা না করে অনোমদর্শী আত্মপরিচয় দিল। তারপর অনুচ্চ কণ্ঠে রামপাল-প্রেরিত সব কথা বলে গেল চণ্ডককে।

আলাপের শেষ দিকে চাপা স্বরে চণ্ডক বলল, 'তোমার মাথাটা এ মুহূর্তে আমি মাটিতে নামিয়ে দিতে পারি, অনোমদর্শী। কিন্তু একজন সাধারণ বৌদ্ধের মস্তক ছিন্ন করার মধ্যে কোনো গৌরব নেই। তা ছাড়া এখানে তোমাকে হত্যা করলে একটা হইচই পড়ে যাবে। এদের স্বাভাবিক জীবনে আমি অস্থিরতা সৃষ্টি করতে চাই না।' তারপর গর্জন করে বলল, 'রামপালকে গিয়ে বলো—আমার নাম চণ্ডক, বরেন্দ্রি সূর্য ভীমের সেবক আমি।'

অত্যন্ত শান্ত কণ্ঠে অনোমদর্শী বলল, 'সেনাপ্রধান চণ্ডক, আমি জানি, আপনি এই মুহূর্তে আমাকে বধ করতে পারেন। আমি একজন সামান্য দূত। রামপালের সংবাদবাহক হয়ে আপনার কাছে এসেছি। রামপাল বলেছেন, মহারাজ ভীমের পরাজয় অনিবার্য। তাঁর বিরুদ্ধে রামপাল স্বয়ং এবং চৌদ্দজন সামন্ত অস্ত্র উঠিয়েছেন। কৈবর্তভীমকে বিরান করবেন তাঁরা।' একটু থামল অনোমদর্শী। মুহূর্তকাল কী যেন ভাবল সে। তারপর আবার বলল, 'রাজা রামপাল আপনার বীরত্বে মুগ্ধ। শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা হিসেবে আপনার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা রয়েছে তাঁর। আপনি যদি তাঁকে সহযোগিতা করেন, আপনাকে তিনি তাঁর বাহিনীর প্রধান সমরনায়ক করবেন। প্রধান সেনাপতির মানমর্যাদা আর ক্ষমতার কথা আপনার অজানা নয়।'

অনোমদর্শীর কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উষ্ণ কণ্ঠে চণ্ডক বলে উঠল, 'শোনো অনোমদর্শী, তুমি আমাকে সেনাপ্রধান বলে সম্বোধন করেছ—এটা ঠিক নয়। আমি ভীমবাহিনীর সেনাপ্রধান নই, অনেক সেনানায়কের একজন। আর রামপালকে বলবে, ভীমকে পরাজিত করা অসম্ভব।'

এবার আরও শান্ত মোলায়েম কণ্ঠে অনোমদর্শী বলল, 'সেনাপ্রধান হতে তো আপনার কোনো বাধা নেই। শুধু সামান্য সহযোগিতা। বিনিময়ে কল্পনাতীত প্রাপ্তি। রাজা ভীমের একজন সাধারণ সমরনায়ক বৌদ্ধ রাজদরবারে সেনাপ্রধানের আসনে বসে আছেন। ওই দরবারে মহারাজ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রামপালের পরে আপনার মর্যাদা। মন্ত্রী-উপমন্ত্রী, রাজন্যবর্গ আপনার সঙ্গে কোমর ভেঙে মাথা ঝুঁকিয়ে কথা বলছেন। রাজার কাছ থেকে, প্রধান অমাত্যদের কাছ থেকে অশেষ শ্রদ্ধা পাচ্ছেন আপনি। ভেবে দেখুন একবার, এ রকম দৃশ্যের কথা।'

চণ্ডকের চোখ একটুক্ষণের জন্য একটুখানি চকচক করে উঠল কি না আলো-আঁধারের এই স্থানে, বোঝা গেল না। ক্ষুব্ধ স্বরে চণ্ডক বলে উঠল, 'চলে যাও অনোমদর্শী এখান থেকে, এখনই। নইলে তোমার মুণ্ড ধুলায় গড়াবে।' অনোমদর্শী বিগলিত কণ্ঠে বলল, 'আমি চলে যাচ্ছি, সেনাপ্রধান চণ্ডক। ভেবে দেখবেন আমার প্রস্তাবটি।' বলে ফটকের দিকে রওনা দিল অনোমদর্শী।

দূরে দাঁড়ানো দেহরক্ষীপ্রধান সুখলালকে কী একটা আদেশ দিতে গিয়ে থেমে গেল চণ্ডক। অনোমদর্শী ধীর পায়ে বারাঙ্গনাপল্লি থেকে বেরিয়ে আঁধারে মিলিয়ে গেল।

এদিকে চণ্ডকের কানে প্রতিধ্বনিত হতে থাকল—সেনানায়ক থেকে সেনাপ্রধান। অগাধ ক্ষমতার অধীশ্বর। বৌদ্ধ দরবারে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ আসনে বসার অধিকার। অমাত্যবর্গের মাথা ঝুঁকিয়ে সম্মান প্রদর্শন।

ছোটবেলাটা বড় কষ্টে কেটেছে চণ্ডকের। বাপের পরিচয় নেই, মা পাগলি। তার পরিচয় পাগলির বেটা বলে। যেখানে যা পেত, তা দিয়ে পেটাত মা, মাঝেমধ্যে বুকে চেপে ধরে হু-হু করে কাঁদত। এখানে-ওখানে ভেসে বেড়াত মা আর ছেলে। ঝড়বৃষ্টিতে মাথা গোঁজার ঠাঁই নেই। হি হি শীতে গায়ে বস্ত্র নেই। মা তখন তার পরনের ছেঁড়া শাড়ি দিয়ে ছেলের হাত-গা-মাথা ঢাকার চেষ্টা করত, অবিরাম। তার নিজেরও তেমন জামাকাপড় ছিল না। সেই কবে কোন এক দয়ালু পথিক একজোড়া জামা দিয়েছিল, একসময় তা ছিঁড়ে ফালা ফালা হয়ে গিয়েছিল। তা-ই পরে থাকত চণ্ডক। ধুলায় ধূসরিত দুজনই, মা আর ছেলে। খাবার জুটত না। পাগলি মা তার এ-বাড়ি ও-বাড়ি ঘুরে বেড়াত, পেছনে ক্ষুধার তাড়নায় অস্থির সে। অধিকাংশ মানুষ ফিরিয়ে দিত তাদের। ফিরিয়ে দিত বললে ভুল হবে, তাড়িয়েই দিত। বলত, 'যা যা পাগলি, কী নোংরা কাপড়চোপড় রে বাপ! দেখলে ঘেন্না লাগে। যা যা, অই বাড়ি যা। এখানে কিছু পাবি না।' কোনো বাড়ির মহিলা রান্নাঘরের দিকে মুখ তুলে উঁচু গলায় বলত, 'দেখ তো বল্লরী, হেঁসেলে কিছু আছে কি না। গত দিনের বাসিবুসি কিছু থাকলে পাগলি আর তার বেটারে দে তো।' এই তো ছিল তার বাল্যজীবন!

একদিন মহারাজ ভীম তাকে তুলে আনলেন এই রাজপ্রাসাদে। তখনো ভীম রাজা হননি। দিব্যোকের ডান হাত তখন তিনি। এই যেমন আজ আমি। ভীম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাকে রাজপ্রাসাদে ঠাঁই দিলে কী হবে, রাজপুত্রের যথাযথ মর্যাদা কি সে পেয়েছে? পায়নি। তার সঙ্গে সঙ্গে বড় হলো শর্ব। শর্বের মতো তাকে মর্যাদা দেওয়া হলো কোথায়? সে যে প্রকৃত রাজপুত্র নয়, পদে পদে তাকে সেটা বুঝিয়ে দেওয়া হলো। মহারানি দেবলা, শর্ব, প্রধান সেনাপতি কঙ্কণ, অর্থমন্ত্রী বিল্বমঙ্গল বারবার তাকে বুঝিয়ে দিল—তুমি পথের ছেলে ছাড়া আর কিছু নও, চণ্ডক। মহারাজ ভীম তোমাকে করুণা করে আশ্রয় দিয়েছিল বলে আজ এতটুকু উঠতে পেরেছ। তুমি ঋণী এই রাজপ্রাসাদের কাছে, মহারাজ ভীমের কাছে।

আমি কি আমার শরীরের রক্তকণা ঝরিয়ে বারবার প্রমাণ দিইনি যে, আমি মহারাজের কাছে, এই রাজপ্রাসাদের প্রতিটি পাথরের কাছে কৃতজ্ঞ? দিয়েছি। তার পরও মহারাজ ভীম ছাড়া অন্য কারও কাছে আমি মর্যাদা পাইনি। সবার জীবনে সুখ এল, মান এল, মর্যাদা এল। আমার জীবনে এল কোথায়? শেষ পর্যন্ত কৌশলে তাকে রাজপ্রাসাদ থেকেই তো বের করে দেওয়া হলো। ঠাঁই হলো কোথায়? ওই বহিরাঙ্গনে। বড় হওয়া সত্ত্বেও শর্বদেবকেই আগে বিয়ে করিয়ে দেওয়া হলো। শর্বদেব যা আকাঙ্ক্ষা করে, তা পূরণ করে দেন মহারাজ ভীম। তাঁর কাছে, তাঁর অর্থমন্ত্রীর কাছে তার মর্যাদার কোনোই মূল্য নেই। না হয় তারুণ্যের বশবর্তী হয়ে সে নবরত্ন হারটি নিয়ে গেছে মোহনার জন্য। তাঁর ছেলে হলে তিনি কি ক্ষমা করে দিতেন না? অবশ্যই দিতেন। কিন্তু তাকে কী করলেন মহারাজ? ডেকে পাঠালেন। বললেন, তাহলে কি ধরে নেব, পুত্রস্নেহে যাকে বড় করেছি, সে লুণ্ঠনকারী? আমি কি লুণ্ঠনকারী? নিজের ঘরের জিনিস নেওয়াকে কি লুণ্ঠন বলে? হারটি যদি শর্ব নিত, কপর্দী নিত, শম্ভু নিত—তাহলে কি তাদের লুণ্ঠনকারী বলতেন ভীম? বলতেন না। কিন্তু তিনি আমাকে বলেছেন। কেন বলেছেন? আমি তার ঔরসে মহারানি দেবলার গর্ভে জন্ম নেওয়া ছেলে নই বলে বলেছেন। তাই আমার জন্য এত অবহেলা, এত তাচ্ছিল্য!

অর্থমন্ত্রী বিল্বমঙ্গল এই রাজপ্রাসাদের বেতনভোগী কর্মচারী মাত্র। সে কিনা তাকে তিরস্কার করে! তাকে ফিরিয়ে দেয়! দুকড়ির অর্থমন্ত্রী বলে—এখনই তুমি এখান থেকে যাও, নইলে শক্তি প্রয়োগ করা হবে তোমার ওপর। আর কত, আর কত অপমান সহ্য করবে চণ্ডক? শর্ব বড় ভাইয়ের মর্যাদা দেয় না, দেবলা পুত্রের স্নেহ দেন না, মন্ত্রী অমাত্যরা যথাযথ সম্মান জানান না। দিন-রাতের এসব অপমান আর কত সহ্য করবে সে?

আর ক্ষমতা! সকল ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত থাকল মহারাজ ভীমের হাতে। ক্ষমতা আছে শর্বদেবের হাতে, ক্ষমতা আছে মন্ত্রী-রাজন্যদের হাতে। তার হাতে কী আছে? তার হাতে আছে খড়্গ। ওই খড়্গ দিয়ে সে শত্রুনিধন করে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ত্রাস সৃষ্টি করে পালশিবিরে। বিনিময়ে পায় কী সে? পায়—বাহ্‌বা, পিঠ চাপড়ানো। প্রবল ক্ষমতার অধিকারী হতে পারল না সে। ভীমবাহিনীতে সে হয়ে থাকল সামান্য একজন সেনানায়ক। তার মতো সেনানায়ক ভীমবাহিনীতে আরও কয়েক গন্ডা আছে। সেনাপ্রধানের পদ তো স্বপ্নের পদ। সেনাপ্রধানের পদটি দখল করে আছে কঙ্কণ। ভীমের পরই কঙ্কণের ক্ষমতা। তার কথাতেই গোটা বাহিনী উঠবস করে। তাকেও নতমস্তকে কঙ্কণের আদেশ পালন করতে হয়। কঙ্কণের ক্ষমতার কাছে তাকে ঠুঁটো জগন্নাথই বলা চলে।

ভাবতে ভাবতে চণ্ডকের মনটা বিষিয়ে উঠল সে রাতে। মোহনার কাছে বিদায় নিয়ে দরজা থেকে বেরিয়ে এল সে। অবাক বিস্ময়ে মোহনা কী যেন জিজ্ঞেস করতে চাইল তাকে। কিন্তু ডান হাত তুলে মোহনাকে থামিয়ে দিল চণ্ডক। বেশ অস্থির দেখাল তাকে। চণ্ডককে এ রকম বিচলিত হতে এর আগে কখনো দেখেনি মোহনা।

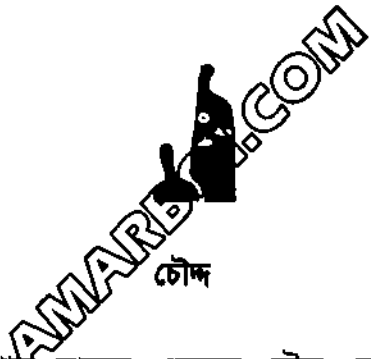

চৌদ্দ

সেদিনের যুদ্ধে হরিপাল নামের একজন বৌদ্ধ সেনানায়ক ধরা পড়ল ভীমসেনাদের হাতে। হরিপাল বয়স্ক কিন্তু সুঠামদেহী। রামপালের অন্যতম দক্ষ সেনাপতি সে। সেদিনের যুদ্ধে হরিপাল ছিল বিধ্বংসী। যুদ্ধক্ষেত্রে অনেক ভীমসেনাকে হতাহত করেছে সে। শর্বদেব এগিয়ে না এলে আরও কত সৈন্য যে তার তরবারির আঘাতে দ্বিখণ্ডিত হতো, তার কোনো হিসাব নেই। তুমুল যুদ্ধ হয়েছে শর্বদেব আর হরিপালের মধ্যে। অভিজ্ঞতা, বিচক্ষণতা আর শক্তিতে হরিপাল শর্বদেবের চেয়ে এগিয়ে। যুদ্ধে কিছুতেই পেরে উঠছিল না শর্বদেব। একসময় হরিপালের তীক্ষ্ণ তরবারির আঘাতে শর্বদেবের ঘোড়াটি নিহত হলো। বাহনশূন্য হয়ে শর্বদেব মাটিতে দাঁড়িয়ে আত্মরক্ষা করতে বাধ্য হলো। ছুটন্ত ঘোড়া থেকে তরবারি চালাতে উদ্যত হয়েছিল হরিপাল। ওই সময় ভীমের একজন সৈন্য শর্বদেবকে আড়াল করে না দাঁড়ালে শর্বদেবের মস্তক ধুলায় গড়াত। নিজের জীবন দিয়ে শর্বদেবের প্রাণ বাঁচিয়েছিল সেই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সৈন্যটি। মৃত্যুর আগে সে হরিপালের ঘোড়ার সম্মুখের পায়ে প্রচণ্ড শক্তিতে গদার আঘাত করেছিল। হুমড়ি খেয়ে পড়েছিল হরিপালের ঘোড়াটি। ডান পায়ের গোড়ালি নড়ে গিয়েছিল হরিপালের।

তারপর যুদ্ধ হয়েছিল সামনাসামনি, মাটিতে দাঁড়িয়ে। শর্বদেবের সামনে আর বেশিক্ষণ দাঁড়াতে পারেনি হরিপাল। আঘাতে আঘাতে জর্জরিত হয়েছিল। শর্বদেবের শারীরিক ক্ষতিও কম হয়নি। কিন্তু হরিপালের শারীরিক ক্ষতি হয়েছে বেশি।

ওই দিনের যুদ্ধ শেষে বিচারসভা বসেছে ভীমছাউনিতে। আহত হরিপালকে ছেঁচড়িয়ে ভীমের সামনে আনা হয়েছে। সমবেত সেনানায়কদের মধ্য থেকে দাবি উঠল—মৃত্যুদণ্ড দিন, মহারাজ, হরিপালকে হত্যা করা হোক।

চণ্ডক হঠাৎ বলে উঠল, 'বৃদ্ধ, গুরুতর আহত হরিপালকে হত্যা করার দরকার নেই, মহারাজ। এমনিতেই সে নিহতপ্রায়। হয় বন্দী করে রাখুন, নয় ছেড়ে দিন। পঙ্গু শরীর নিয়ে হরিপাল আর কখনো যুদ্ধক্ষেত্রে ফিরে আসতে পারবে না।'

সেনাপ্রধান কঙ্কণ বললেন, 'শত্রু শত্রুই। বৃদ্ধ আর আহত—এটা কোনো যুক্তি নয়। হরিপালকে ছাড়লে সে কাল না হয় পরশু, পরশু না হয় এক মাস পরে যুদ্ধক্ষেত্রে ফিরে আসবে। শত শত ভীমসেনাকে হত্যা করবে এই নরাধম।' তারপর একটু থেমে কঙ্কণ আবার বলা শুরু করলেন, 'চণ্ডক জানে না এই হরিপাল আজকের যুদ্ধে কতজন ভীমসেনাকে হত্যা করেছে। চণ্ডক এ-ও জানে না যে, এই নরাধমের হাতেই আজকে আমাদের যুবরাজ নিহত হতে যাচ্ছিল। শত্রুর শক্তিকে কখনো অবহেলা করা উচিত নয়। হত্যা করা হোক ওই পশুটাকে। তার মুণ্ড বিচ্ছিন্ন করার আদেশ দিন, মহারাজ।'

চণ্ডক বলল, 'একজন বয়োবৃদ্ধকে হত্যা করার মধ্যে মহারাজের কৃতিত্বটা কোথায়? হরিপালকে ছেড়ে দেওয়া হোক, মহারাজ।'

এবার উষ্ণ কণ্ঠে কঙ্কণ বললেন, 'তুমি ভুল পথে মহারাজকে পরিচালিত করছ, চণ্ডক। কৃতিত্ব বয়োবৃদ্ধকে হত্যা করার মধ্যে নয়, কৃতিত্ব প্রবল শত্রুকে নিধনের মধ্যে। হরিপাল মহারাজ ভীমের প্রবল শত্রু। তাই সে নিধনযোগ্য। হরিপালকে ছেড়ে দেওয়ার পক্ষে চণ্ডক যে যুক্তি দেখাচ্ছে, মহারাজ, সে যুক্তি খোঁড়া। মহারাজ, হরিপালকে ছেড়ে দিলে আপনার মস্ত বড় ক্ষতি হয়ে যাবে।'

হরিপালের ব্যাপারটি আর সামষ্টিক থাকল না। চণ্ডক আর কঙ্কণের ব্যক্তিগত দ্বন্দ্বে রূপ নিতে থাকল। মানবিক বোধের মাটিতে দাঁড়িয়ে চণ্ডক বিষয়টি বিবেচনা করতে চাইল, আর কঙ্কণ পুরো ব্যাপারটাকে বাস্তবতার নিরিখে বিচার করলেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পদমর্যাদার কথা ভুলে প্রকাশ্য দরবারে মহারাজ ভীম এবং এত জন সমরনায়কের সামনে চণ্ডক ঝাঁজিয়ে উঠল, 'রাখুন আপনার লাভ-ক্ষতি। সেনাপ্রধান বলে আপনার সব কথা মানতে হবে নাকি?'

এ সময় শর্বদেব প্রায় গর্জন করে উঠল, 'সাবধান তুমি, চণ্ডক। তুমি সীমা অতিক্রম করছ। পদমর্যাদার কথা তুমি ভুলে গিয়ে অর্বাচীনের মতো কথা বলছ। ভীমবাহিনীর প্রধান শক্তি তার শৃঙ্খলার মধ্যে। তুমি সেই শৃঙ্খলা ভাঙতে চাইছ। আর হ্যাঁ, কেন, কেন তুমি ওই অপরাধীর পক্ষ নিয়ে কথা বলছ? কেন তুমি তাকে বাঁচাতে চাইছ? কোনো দুরভিসন্ধি আছে কি তোমার মনে?'

অবাক চোখে চণ্ডক কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল শর্বদেবের দিকে। তারপর কর্কশ কণ্ঠে বলে উঠল, 'কিসের দুরভিসন্ধির কথা বলতে চাইছ তুমি, শর্ব? তুমি কি আমাকে বিশ্বাসঘাতক বলতে চাইছ?' তারপর হতাশ কণ্ঠে বলল, 'ভয়ানকভাবে আহত একজন মানুষকে হত্যা না করার জন্য বলছি আমি।'

কঙ্কণ বললেন, 'তুমি একজন মানুষকে বাঁচাতে চাইছ না, তুমি বাঁচাতে চাইছ একজন নির্মম হত্যাকারী বৌদ্ধকে।'

'আর কলঙ্কিত করতে চাইছ নিজেকে, রক্তসংকুল করে তুলতে চাইছ মহারাজ ভীমের জীবনকে। অবিবেচক তুমি,' রাগান্বিত কণ্ঠে বলল শর্বদেব।

চণ্ডক হঠাৎ খুব অসহায় বোধ করতে লাগল। সে শুধু একজন আহত মানুষকে হত্যা না করার প্রস্তাব দিয়েছে। এই প্রস্তাব তো কার্যকর হয়নি। সেটাকেই টানতে টানতে কঙ্কণ আর শর্ব কোথায় নিয়ে যাচ্ছে? কী আশ্চর্য! মহারাজ ভীমও চুপ করে আছেন। কঙ্কণ আর শর্বের এই অপব্যাখ্যার কোনো প্রতিবাদ করছেন না তিনি, বরং চুপ করে তামাশা দেখছেন। এটা উচিত হচ্ছে না। চণ্ডক আহত হরিপালকে দেখিয়ে ভীমের উদ্দেশে বলল, 'ওই লোকটিকে ভালো করে লক্ষ করুন, মহারাজ। সে রক্তাক্ত, কথা বলার শক্তি হারিয়েছে সে। বন্দী হরিপাল মাটিতে লুটিয়ে পড়ছে বারবার। সে অর্ধমৃত। যা শাস্তি পাওয়ার, তা সে এর মধ্যে পেয়ে গেছে। ওকে ছেড়ে দিলে আপনার এমন কী ক্ষতি হবে, মহারাজ?' একটু থেমে চণ্ডক আবার বলল, 'ওই জায়গায় আপনি নিজেকে কল্পনা করুন একবার।'

'কী, কী বললে তুমি, চণ্ডক? একজন নরাধমের জায়গায় বরেন্দ্রির সূর্যকে কল্পনা করতে বলছ তুমি?' তরবারির হাতলে ডান হাত রেখে কঙ্কণ দেব দ্রুত পায়ে চণ্ডকের দিকে এগিয়ে গেলেন।

এই সময় জলদগম্ভীর কণ্ঠে মহারাজ ভীম বলে উঠলেন, 'থামুন সেনাপ্রধান কঙ্কণদেব।' তারপর চণ্ডকের দিকে ফিরে বললেন, 'তুমি দক্ষ যোদ্ধা, সমস্ত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভীমবাহিনীর কেউ তা অস্বীকার করে না। তাই বলে তুমি তো সীমা লঙ্ঘন করতে পারো না! এ যুদ্ধের সেনাপ্রধান কঙ্কণদেব। তাঁর অধীনে তুমি একজন সাধারণ সেনানায়ক ছাড়া আর কিছু নও। কঙ্কণদেবের পদমর্যাদার কথা তুমি ভুলে গেলে!' তারপর গলায় আরও গাম্ভীর্য ঢেলে ভীম বললেন, 'কঙ্কণদেব যথার্থ বলেছেন—শত্রুকে বাঁচিয়ে রাখতে নেই। হরিপালকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হলো। এখনই তাকে শূলে চড়ানো হোক।'

মহারাজ ভীম আদেশ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত বিচারসভা হাসিতে ফেটে পড়ল। কারও কারও মুখ থেকে উপহাসের ধ্বনি বেরিয়ে এল। সবার কণ্ঠকে ছাপিয়ে গেল কঙ্কণদেবের উচ্চহাস্য। ব্যঙ্গের হাসি নিয়ে চণ্ডকের দিকে তাকিয়ে থাকল শর্বদেব। চণ্ডকের মনে হলো—এই অট্টহাসি, এই ব্যঙ্গের চাহনি, বিকৃত উপহাসধ্বনি বিষ্ঠা হয়ে তার নাকে-মুখে, হাতে-পায়ে—সর্বশরীরে ঝরে পড়ছে। সেই দুর্গন্ধময় বিষ্ঠার মধ্যে অসহায় চণ্ডক হাবুডুবু খাচ্ছে।

মহারাজ ভীম বিচারসভা ত্যাগ করলেন। তারপর ধীরে ধীরে কঙ্কণদেব, শর্বদেব এবং অন্যান্য সমরনায়ক বিচারসভা ছেড়ে গেলেন। চারজন সৈনিক হরিপালকে টেনে-হেঁচড়ে তাঁবুর বাইরে নিয়ে গেল।

বিশাল তাঁবুর মাঝখানে, উজ্জ্বল আলোর নিচে নিঃসঙ্গ চণ্ডক দাঁড়িয়ে থাকল। হঠাৎ নিজেকে বড় অসহায় আর একাকী মনে হতে লাগল তার। চোখে সে আঁধার আঁধার দেখতে লাগল। একটি বাক্য তার কানে বজ্রের আওয়াজের মতো ভেসে আসতে লাগল : 'তুমি একজন সাধারণ সেনানায়ক ছাড়া আর কিছু নও।'

সাধারণ মানে তুচ্ছ। তাহলে আমি ভীমের কাছে একজন তুচ্ছ সৈনিক ছাড়া আর কিছুই নই। আমার সারা জীবনের যুদ্ধ, আমার আত্মত্যাগ, আমার ঘাম, আমার শ্রম, আমার শ্রদ্ধা, আমার আনুগত্য, আমার কৃতজ্ঞতা—কিছুরই মূল্য নেই মহারাজ ভীমের কাছে? আমি তাহলে অন্য দশজন বেতনধারী সৈনিকের মতো? ভাবতে ভাবতে চণ্ডকের মনের মধ্যে অপমানের আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল। বেদনায় অসম্মানে তার ভেতরটা অঙ্গার হয়ে যেতে লাগল। প্রাণ হাতে নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে যাঁর পাশে পাশে যে থাকে, সেই চণ্ডকের কথাকে কোনো মূল্যই দিলেন না ভীম! বরং অপমান করতে কঙ্কণ আর শর্বকে সহায়তা করলেন। তাহলে আর কেন জীবনবাজি? আর কেন পাশে পাশে ঘোরা? আর কেন কৃতজ্ঞতা? যার কাছে কঙ্কণ বড়, যার কাছে সে প্রয়োজনের সামগ্রী ছাড়া আর কিছুই নয়, তার সঙ্গে আর না। জীবন বাজি আর না। কৃতজ্ঞতা আর না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভাবতে ভাবতে চণ্ডক বিচারসভা থেকে বেরিয়ে এল। অন্ধকারে ঘোরের মধ্যে হাঁটতে শুরু করল সে। হাঁটতে হাঁটতে একসময় একটা টিলার নির্জন চূড়ার ওপর এসে দাঁড়াল। পশ্চিমে হেলে পড়া চাঁদের ম্লান আলো যুদ্ধক্ষেত্রের পরিবেশকে অধিকতর ভয়াল করে তুলেছে। হঠাৎ কণ্ঠ ফাটিয়ে সে চিৎকার করে উঠল : 'আর নয় কৃতজ্ঞতা, এবার কৃতঘ্নতার পালা।' বলতে বলতে হু হু কান্নায় ভেঙে পড়ল চণ্ডক। অফলার বাতাসে তার আর্তনাদ প্রতিধ্বনি তুলল।

পরের রাতে অনোমদর্শী এসে দেখা করেছিল চণ্ডকের সঙ্গে। তারই ব্যবস্থাপনায় রামপালের সঙ্গে বৈঠক হয়েছিল তার।

সে রাতের ঘন আঁধারে চণ্ডক যে তাঁবু থেকে বেরিয়ে পড়েছিল, সে খবর ভীমের কাছে নিয়ে এসেছিল গুপ্তচর। মহারাজ ভীম গুপ্তচরের এই সংবাদকে গুরুত্ব দেননি। ভেবেছেন, চণ্ডকের একটু বারাঙ্গনাদোষ আছে। মাঝেমধ্যে মোহনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যায়। আজকেও হয়তো গেছে।

গুপ্তচর রঘুনন্দন বলেছিল, 'চণ্ডকদেব একা গেছেন, মহারাজ।'

ভীম বলেছেন, 'সব সময় দেহরক্ষী নিয়ে ঘুরতে কার ভালো লাগে? আজকে হয়তো চণ্ডক একা বেরোতে পছন্দ করেছে।'

গুপ্তচর রঘুনন্দন ফিরে গিয়েছিল সে রাতে।

সত্যি সে রাতে একা বেরিয়েছিল চণ্ডক। দেহরক্ষীরা পিছু নিলে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। সুখলালকে বলেছিল, 'সব সময় দেহরক্ষী নিয়ে ঘুরতে ভালো লাগে না, সুখলাল। তুমি তো জানো, আমি কোথায় যাই। সেখানে তোমাদের উপস্থিতি আতঙ্ক ছড়ায়। বারাঙ্গনাপল্লির একটা ঘরকে ঘিরে তোমরা দাঁড়িয়ে আছ আর আমি আছি ভেতরে; ব্যাপারটা খুবই অশোভন, অশ্লীলও বলতে পারো।'

সুখলাল ইতস্তত করে বলল, 'মহারাজের কড়া নির্দেশ আছে—আপনাকে সর্বদা পাহারা দিয়ে রাখার।'

'সেই নির্দেশ আজকে না-ই বা মানলে,' কৃত্রিম মোলায়েম কণ্ঠে বলেছিল চণ্ডক।

সুখলাল স্পষ্ট বুঝল, আজকে চণ্ডকদেবকে অনুসরণ করা হোক—সেটা কিছুতেই চাইছে না সে। কিন্তু কেন চাইছে না? এর মধ্যে কি কোনো গূঢ়ার্থ লুকিয়ে আছে? চণ্ডকদেব মোহনার ঘরে শুধু আজকে তো যাচ্ছে না, তাকে অনুসরণ করার ব্যাপারটিও আজকে নতুন নয়। চণ্ডক মোহনার ঘরে যায়, আমরা বাইরে দাঁড়িয়ে থাকি। অনেকটা নির্বাক হয়েই পুতুলের মতো নিশ্চলতা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিয়ে আমাদের কর্তব্য সম্পন্ন করি। দেহরক্ষীদের দ্বারা চণ্ডকদেবের কর্মকাণ্ডে তো কোনোরূপ বিঘ্ন ঘটে না! যেমন সেদিন, সেদিন আমাদের এড়িয়ে বারাঙ্গনাপল্লিতে গেল। ভাগ্যিস, আমরা তাকে অনুসরণ করেছিলাম। নইলে ওই লোকটি, হরিলাল না কী নাম, সরাসরি তার সঙ্গে দেখা করতে এগিয়ে গিয়েছিল যে, সে তো কোনো ক্ষতি করতে পারত চণ্ডকদেবের! ক্ষতির কথা মনে আসতেই একটু সতর্ক হয়ে পড়ল সুখলাল। কী আশ্চর্য! সেদিন হরিলালের সঙ্গে চণ্ডকদেবের সাক্ষাতের পর সমরনায়ককে খুব বিচলিত মনে হয়েছিল কেন? হরিলাল তো মহারাজ ভীমেরই গুপ্তচর। তার সঙ্গে দেখা হওয়ার পর চণ্ডকদেবের তো এত বিচলিত হওয়ার কথা নয়। সাক্ষাতের পর যুদ্ধকাণ্ডে তেমন তো কোনো প্রভাব পড়েনি। হরিলাল চলে যাওয়ার সময় চণ্ডকদেব হাত তুলে আমাকে কী একটা যেন নির্দেশ দিতে গিয়ে থেমে গিয়েছিল, কেন?

একধরনের অশুভ চিন্তা সুখলালের ভেতরটা আলোড়িত করতে লাগল। বিনীত কণ্ঠে সে বলল, 'আমাদের কর্তব্য আমাদের সম্পন্ন করতে দিন, সমরনায়ক।'

সুখলালের কথা শুনে চণ্ডকের মধ্যে রাগ চাগিয়ে উঠল। কর্কশ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কি আমার ব্যক্তিস্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করতে চাইছ?'

'না সমরনায়ক, আপনার নিরাপত্তার কথা ভাবছি।'

'আমার নিরাপত্তার কথা আমাকে ভাবতে দাও, সুখলাল। তোমাদের আদেশ দিচ্ছি—আজকে আমার সঙ্গে এসো না তোমরা।' তার এ কড়া আদেশ দেহরক্ষীদের মনে কোনোরূপ সন্দেহ সৃষ্টি করতে পারে—এ আশঙ্কায় চণ্ডক সুখলালের কাঁধে হঠাৎ ডান হাত রেখে কোমল কণ্ঠে বলল, 'অন্তত একটা রাত মোহনার সঙ্গে একান্তে মিলনের সুযোগ দাও, সুখলাল!'

চণ্ডকের কথায় সুখলালের অন্তরে একটা বিগলিত ভাবের সৃষ্টি হলো। মাথা নুইয়ে সুখলাল বলল, 'আচ্ছা, ঠিক আছে, সমরনায়ক। আপনার যাত্রা শুভ হোক।'

চণ্ডক দাঁত কড়মড় করে মনে মনে বলল, শুভ তো হবেই, মর্কটের বাচ্চা। শুভর জন্যই তো তোদের সঙ্গে এ রকম নরম সুরে কথা বলা।

চণ্ডক বলল, 'শোনো সুখলাল, আমার একা যাবার ব্যাপারটি যাতে মহারাজ ভীম জানতে না পারেন। জানতে পারলে তিনি খুব বিচলিত হয়ে পড়বেন। আমাকে তিনি খুব ভালোবাসেন কিনা!'

'ঠিক আছে, সমরনায়ক,' সুখলাল বলল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পনেরো

সে রাতে একান্তে কথা হয়েছিল রামপালের সঙ্গে চণ্ডকের। কী কথা হয়েছিল—ওঁরা দুজন ছাড়া কেউ জানে না।

পরদিন যুদ্ধক্ষেত্রে শুধু হতবাক হয়ে উভয় পক্ষের সৈন্যরা দেখেছিল এক হৃদয়বিদারক দৃশ্য।

পরদিনও যুদ্ধ হয়েছিল অফলায়। সকালেই রণদামামা বেজে উঠেছিল। হুংকার দিয়ে সৈন্যরা ছুটেছিল বিপরীত দিকে। ভীমসেনার হাতে হাতে বর্শা, তির-ধনুক, বল্লম, গদা, তলোয়ার, খড়্গ। কেউ পদবিক্ষেপে, কেউ ঘোড়ায় বা কেউ মহিষে চড়ে অগ্রসরমাণ। রামপালের তুলনায় ভীমবাহিনীতে রণহস্তীর সংখ্যা বেশি।

বরেন্দ্রি সূর্য ভীম চড়েছেন হিমালয়ে। বলশালী, ধীরস্থির রণহস্তী হিমালয়। লৌহিত্য নদীর ওপারের গহিন অরণ্য থেকে হিমালয়কে আনা হয়েছিল। রণদামামা বা হাজার কণ্ঠের হুংকারে হিমালয় বিচলিত হয় না। চৌকস, দ্রুতগতির এই হস্তীতে চড়ে ভীম অফলায় যুদ্ধ করে যাচ্ছেন।

আর চণ্ডক যুদ্ধ করে কৈলাসে চড়ে। কৈলাস অসীম শক্তিশালী মহিষ। দ্রুতগতিসম্পন্ন। টকটকে লাল চোখ তার। হিংস্র। দাপুটে এই মহিষটি চণ্ডককে পিঠে নিয়ে সমস্ত যুদ্ধক্ষেত্রে দাপিয়ে বেড়ায়।

মহারাজ ভীম আর চণ্ডক দুজনে পাশাপাশি থেকে আজ যুদ্ধ করে যাচ্ছেন। আরও একজন আছে ভীমের ডান পাশে। সে শর্বদেব। অশ্বারোহী সে, হাতে তীক্ষ্ণধার তরবারি। পিঠে তির-ধনুক। হিমালয় যেদিকে যায়, কৈলাসও যায় সেদিকে। ভীম আর চণ্ডক—দুজনই আজ দুর্দমনীয়। ঝাঁকে ঝাঁকে তির ছুটে আসছে তাঁদের দিকে। ঢাল দিয়ে তীক্ষ্ণ তির ঠেকাচ্ছেন দুজনে। বর্শা, তির, বল্লমের আঘাতে আঘাতে জর্জরিত হচ্ছে হিমালয় আর কৈলাস। তিরে তিরে ছেয়ে গেছে অফলার আকাশ। হাজার তলোয়ার একসঙ্গে ঝলসে উঠছে অফলার যুদ্ধক্ষেত্রে। বর্শায় বিদ্ধ হয়ে করুণ চিৎকার দিচ্ছে পক্ষ-বিপক্ষের সৈন্যরা। পাল সৈন্যরা আজ শর্বদেবের ওপর চড়াও হয়েছে। শত শত সৈন্য তাকে ঘিরে ধরেছে। শক্তিধর শর্ব তাদের মোকাবিলা করছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাল সেনাদের লক্ষ্য আজ ভীম। ভীম অকুতোভয়। হিমালয়ের পায়ে পিষ্ট হচ্ছে শত শত পাল সৈন্য। তার পাশে কৈলাস। কৈলাসের পিঠে চণ্ডক। ভীমবাহিনীর জয় আজ কেউ ঠেকাতে পারবে না।

রণহুংকারের মধ্যে, অস্ত্র আর শস্ত্রের ঝনঝনানির মধ্যে, মর্মন্তুদ হাহাকারের মধ্যে চণ্ডক তার ডান হাতের খড়্গের অগ্রভাগটা আচমকা হিমালয়ের বাঁ চোখে ঢুকিয়ে দিল। দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে দৌড়াতে শুরু করল হিমালয়। গলগল করে তার বাঁ চোখ থেকে রক্ত গড়াতে লাগল। উন্মাদপ্রায় হিমালয় পাল সৈন্যের চক্রব্যূহের মধ্যে ঢুকে গেল। একটু আগে মাহুত নিহত হয়েছে। বেদিশা হিমালয়।

কৈলাসকে থামিয়ে স্থির চোখে চণ্ডক তাকিয়ে থাকল অপস্রিয়মাণ হিমালয়ের দিকে, ভীমের দিকে। মুখে ক্রূর হাসি।

তিরে তিরে রক্তাক্ত ভীম। কপাল থেকে রক্ত ঝরে ঝরে দুচোখ ঢেকে যাচ্ছে। হিমালয় কোন দিকে যাচ্ছে, ঠাহর করতে পারছিলেন না ভীম। একসময় বাঁ হাতের চেটো দিয়ে দুচোখের রক্ত মুছে ভীম দেখলেন—তাঁর পাশে তাঁর চণ্ডক নেই। তিনি একা। যন্ত্রণাকাতর হিমালয় তাঁকে পিঠে নিয়ে পাল সৈন্যের চক্রব্যূহের মাঝখানে দাঁড়িয়ে। তাঁর যাওয়ার পথ নেই, আত্মরক্ষার উপায় নেই।

পরাজয় নিশ্চিত জেনে বরেন্দ্রির সূর্য ভীম জীবনে প্রথমবারের মতো মাথা নত করলেন। হিমালয়ের পিঠ থেকে মাটিতে নেমে এলেন তিনি। সূর্য তখন মধ্যগগনে, গনগনে রোদ ছড়াচ্ছে।

বরেন্দ্রি সূর্য ভীম, দিব্যোকের ভ্রাতুষ্পুত্র ভীম, কৈবর্ত বংশের শেষ রাজা ভীম পাল বাহিনীর হাতে বন্দী হলেন।

ভীমের বন্দী হওয়ার সংবাদ ছড়িয়ে পড়ল—যুদ্ধক্ষেত্রে, পাল বাহিনী থেকে কৈবর্তশিবিরে, অফলা থেকে ডমরনগরে, ডমরনগর থেকে নানা গঞ্জে-গাঁয়ে এবং জানকির বারাঙ্গনাপল্লিতে।

কৈবর্ত সেনারা ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। বিকেলের মধ্যে যুদ্ধ শেষ হয়ে গেল, অফলায় উড়ল পাল রাজা রামপালের বিজয় পতাকা।

রামপাল পুত্র বিত্তপালকে ডেকে পাঠালেন। বললেন, 'ভীমকে বেশিক্ষণ বাঁচিয়ে রাখা বিপজ্জনক। তুমি ওকে বধ্যভূমিতে নিয়ে যাও। হত্যা করো তাকে, আজকেই। আর একটা নির্দেশ—নির্বংশ করো ভীমকে। ভীমবংশের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কেউ যাতে জীবিত না থাকে—স্ত্রী, পুত্র, পৌত্র, ভাইপো, ভাগিনেয়, এমনকি তাঁর দরবারের রাজন্যরা পর্যন্ত।' রামপাল আরও বললেন, 'দিব্যোকের বংশ রক্তবীজের মতো, দিব্যোকের পর রুদক, রুদকের পর ভীম। ভীমের পর এই কৈবর্তবংশে যাতে আর কেউ মাথা তুলে দাঁড়াতে না পারে।'

বিত্তপাল রামপালের আজ্ঞাধীন। কিন্তু পিতা যে আদেশ করেছেন, তা যথাযথভাবে পালন করা তো বিত্তপালের পক্ষে সম্ভব নয়। কারণ, সে ভীমের কাছের ও দূর-আত্মীয়দের কাউকে চেনে না, শর্বকে ছাড়া।

বিত্তপাল চণ্ডককে ডেকে পাঠাল। বলল, 'ভীমের সবংশ নিধন চাই। ধরে আনো সকল আত্মীয়স্বজনকে। ও হ্যাঁ, রাজন্যরাও যাতে বাদ না যায়। একজনও যাতে বেঁচে না থাকে। নিধনের সকল দায়িত্ব তোমাকে দিলাম চণ্ডক।'

চণ্ডক প্রথমে ছুটল রাজপ্রাসাদের দিকে, সঙ্গে পাল সৈন্য।

ভীমের পরাজয়ের সংবাদ রাজপ্রাসাদে আগেই এসে পৌঁছে গিয়েছিল। রাজমহিষী দেবলা বুঝতে পারলেন—ভীমের মৃত্যু নিশ্চিত, কৈবর্তরাজ্যের ধ্বংস অনিবার্য।

রাজপ্রাসাদের সব নারীকে একত্র করলেন দেবলা। বিষপাত্র তুলে দিলেন সবার হাতে। নিজে পান করলেন সবার আগে।

চণ্ডক কোনো নারীকে রাজপ্রাসাদে খুঁজে পেল না। খুঁজে পেল কপর্দীকে, শম্ভুকে। পথিমধ্যে ধরা পড়ল শর্বদেব, বন্দী হলেন কৃপাসিন্ধু। নিজের খঞ্জর দিয়ে আত্মহত্যা করলেন প্রধান সেনানায়ক কঙ্কণ। সাধারণ পাল সেনার হাতে নির্মমভাবে নিহত হলেন অর্থমন্ত্রী বিল্বমঙ্গল। রাজকোষ লুণ্ঠনে তিনি বাধা দিয়েছিলেন।

AMARBOI.COM

কালিন্দীর তীরে মশান। ভীমকে নিয়ে আসা হয়েছে সেখানে। মশানদণ্ডে বাঁধা হয়েছে তাঁকে। ভীমের পুত্র, পৌত্র, ভাগিনেয়, ভগ্নিপতি, দূর-সম্পর্কের জামাতা, এমনকি ছোট ছোট শিশুকেও ধরে আনা হয়েছে মশানে। চণ্ডক চিনিয়ে দিয়েছে সবাইকে।

মশান ঘিরে পাল সৈন্য। আর বরেন্দ্রির মানুষ। তারা ভীমপ্রেমী। তারা ভিড় করেছে মশানের চারদিকে। তারা নিরস্ত্র। তারা অকুতোভয়। প্রাণের মায়া ত্যাগ করে তারা বধ্যভূমিতে এসেছে। তাদের চোখে চরম উদ্বিগ্নতা, মুখে আর্তনাদ—হায় মহারাজ ভীম, হায় বরেন্দ্রি সূর্য।

পাল সৈন্যরা নির্বিকার। হত্যাযজ্ঞটি নির্বিঘ্নে সমাধা করার দায়িত্ব পড়েছে তাদের ওপর। তারা সশস্ত্র এবং সতর্ক।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছেত্তা ভীমের সামনে একে একে সবার মস্তক ছেদন করল। চণ্ডক বলল, 'প্রথমে শম্ভুর মাথা কাটো।'

সবাই চোখ ঢাকল। ভীম কিন্তু নিষ্পলক। ভগ্নিপতি, ভাগিনেয়, পৌত্রের মস্তক ছেদনের সময় যেমন, দুই পুত্র কপর্দী আর শম্ভুর মাথা বিচ্ছিন্ন হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল যখন, তখনো।

আর চোখ বন্ধ করেনি চণ্ডক। সে মূর্খ ছেত্তাকে বলেছিল, 'আগে ওয়াদের কাটো। দেখে ভীম যন্ত্রণা পাক, তাতেই মোর সুখ।'

যখন তাঁর আত্মীয়স্বজন আর কৃপাসিন্ধুকে একে একে কাটছিল ছেত্তা, ভীম তাকিয়ে থেকেছিলেন সামনের কালিন্দীর দিকে। তারপর চণ্ডকের দিকে মুখ ফিরিয়েছিলেন তিনি। চণ্ডককে উদ্দেশ করে বলেছিলেন, 'চণ্ডক, আমি তোমাকে বিশ্বাস করেছিলাম। পথের ধুলা থেকে কুড়িয়ে এনেছিলাম আমি তোমাকে। এই পালদেরই বলাৎকারের ফসল ছিলে তুমি। পুত্রের স্নেহ দিয়েছিলাম আমি তোমাকে।'

'সেই স্নেহের শোধ দিচ্ছি আজ। অই চেত্তা খর্পর নিয়ে আয়। বড় বাড় বেড়েছিল তার। রাজপ্রাসাদে আমাকে অপমান করার কথা আমি ভুলি নাই। প্রথমে তার দুহাত কাট। ওই হাত দিয়ে সে আমার মাথায় তরবারি তুলেছিল একদিন। তারপর এক কোপে মাথা নামা।' ব্যঙ্গহাসিতে ফেটে পড়ল চণ্ডক।

নির্বিকার কণ্ঠে ভীম বলে গেলেন, 'তুমি বিশ্বাসহন্তা, চণ্ডক। তুমি অপেক্ষা করো। তোমার দিন ফুরিয়ে আসছে।'

কক্ কক্ করে হেসে উঠেছিল চণ্ডক। বলেছিল, 'তোহার দিন শেষ, কৈবর্তের রাজত্ব শেষ।'

AMARBOI.COM

তারপর তিরের ফলা দিয়ে, তরবারির অগ্রভাগ দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে রক্তাক্ত করা হলো ভীমকে। পরে বাঁধন খুলে দেওয়া হলো ভীমের। মশানের মাঝখানে দাঁড় করানো হলো তাঁকে।

সূর্য তখন ডুবু ডুবু। ডুবন্ত সূর্যের লালচে তির্যক আলো বরেন্দ্রি সূর্য ভীমের মুখমণ্ডলে। ছেত্তা নতুন খড়্গ নিয়ে ভীমের দিকে এগিয়ে গেল।

গগনবিদারী কণ্ঠে এই সময় ভীম বলে উঠলেন, 'হে বরেন্দ্রভূমি, জননী আমার, মহারাজ দিব্যোক আর আমি এই দেশে গণমানুষের শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু বিশ্বাসঘাতক চণ্ডকের জন্য আজ তা ব্যর্থ হলো। তুমি নিরাশ হয়ো না, জননী। তুমি অপেক্ষা করো। আমার দৃঢ়বিশ্বাস—আর এক দিব্যোক আসবেন তোমাকে উদ্ধার করার জন্য, এই বরেন্দ্রিতে সাধারণ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মানুষের শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করার জন্য। তাঁর পাশে থাকবে ভীম। তুমি আবার স্বাধীন হবে, জননী। সেদিন বরেন্দ্রির মানুষ আওয়াজ তুলবে—পাল রাজা নিপাত যাক। বরেন্দ্রি কলঙ্কমুক্ত হোক। জয়, গণমানুষের জয়।'

সমবেত জনতা হঠাৎ জয়ধ্বনি দিয়ে উঠল, 'জয়, বরেন্দ্রির জয়; জয়, বরেন্দ্রি সূর্য ভীমের জয়।'

পাল সৈন্যরা সমবেত জনতাকে ছত্রভঙ্গ করার জন্য দ্রুতবেগে এগিয়ে গেল।

ছেত্তা খড়্গাঘাতে বরেন্দ্রি সূর্য ভীমের মস্তক ছেদন করল।

ষোলো

AMARBOI.COM

শেষ বিকেলের মধ্যে মহারাজ ভীম সবংশে নিহত হলেন। ভীম-নিধনের সংবাদ চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। ডমরপুর থেকে গাঙ্গী—সবাই জেনেছিল তাদের মহারাজা বরেন্দ্রি সূর্য ভীম রামপালের হাতে বন্দী হয়েছেন। দুদণ্ড পরে তাদের কাছে সংবাদ এল—শুধু বন্দী নন, নিহতও হয়েছেন ভীম। সংবাদ যত দূরে যায়, নানা ডালপালা জুড়ে। বাড়তে বাড়তে আসল সংবাদ হারিয়ে যায় বানানো সংবাদের মাঝেও কেউ বলছে, 'বাপ রে বাপ, সে কী যুদ্ধ! আমাদের ভীম মাটিতে দাঁড়িয়ে মরণপণ যুদ্ধ করছেন। তলোয়ারের প্রতি কোপে একেকজনের ভবলীলা সাঙ্গ হচ্ছে। শেষে কী হলো, জানো? একটা তির এসে মহারাজের কপাল দিয়ে ঢুকে মাথার পেছন দিয়ে বেরিয়ে গেল। সে কী মরণ যন্ত্রণা রে বাপ!' আরেকজন বলল, 'রাখ রে বেটা তুর মিথ্যা কথার গপ্প। মোরাদের রাজাকে এফোঁড়-ওফোঁড়! ফুঃ! রামপালের এমন কী ক্ষমতা বরেন্দ্রি সূর্যকে ধরার। ওই কুলাঙ্গার চণ্ডক, জারজ চণ্ডকই তো মোরাদের রাজাকে ধরিয়ে দিল গো!'

অন্যজন বলল, 'বীরের মতো মরিছে গো মোরাদের রাজা। মশানে চিৎকার পাড়ল : "চণ্ডক রে তুই মরিবি। আমারে মারিলে কৈবর্ত শেষ হয়ে গেল না বরেন্দ্রি থেকে। দিব্যোক আসিছে। আরেক ভীম আসিছে। বৌদ্ধরা নিপাত যাবে, তুই ধ্বংস হবি।"'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ডালপালা যা-ই হোক, মূল সংবাদ এই যে, চণ্ডকের বিশ্বাসঘাতকতায় মহারাজ ভীম মরেছেন। ভীমকে সবংশে হত্যার জন্য কুলাঙ্গার চণ্ডক দায়ী।

ভীমের নিধনবার্তা প্রচারিত হওয়ার পর ডমরনগরের মানুষ পালাতে লাগল। তারা জানে, রাজার পরাজয়ের পর রাজ্য লুণ্ঠিত হয়, রাজধানী ছারখার হয়। তারা জানে, পালদের হাতে ডমরনগর এবার শ্মশান হবে। প্রাসাদ, স্থাপত্য, হাটবাজার, বিপণি, বাণিজ্যকেন্দ্র, রাজপথ-গলিপথ, জনপদ-বারাঙ্গনাপল্লি কিছুই আস্ত রাখবে না রামপাল। সবকিছু গুঁড়িয়ে দেবে। ডমরনগর থেকে কৈবর্তচিহ্ন নিশ্চিহ্ন করবে। ডমরনগরের বুকে বিশাল শিবমন্দির। দিব্যোকই স্থাপন করেছিলেন এই মন্দির। প্রাতঃকালে এই মন্দিরে মাথা নুইয়ে তারপর দৈনন্দিনের কাজ শুরু করতেন দিব্যোক। এই প্রথা দিব্যোক থেকে রুদক হয়ে ভীম পর্যন্ত প্রসারিত। রাজার দেখাদেখি প্রজারাও প্রণাম করত এই মন্দিরের শিবের চরণে—সকাল-সন্ধ্যায়, দ্বিপ্রহরে-নিশীথে। এই মন্দিরও ধ্বংস করবে রামপাল। রামপাল বৌদ্ধ। শিববিদ্বেষী রামপাল এই মন্দিরটিই প্রথম ধুলায় মিশিয়ে দেবে। তাঁর প্রতিজ্ঞা—বিজিতরাজ্যে কোনো কৈবর্ত থাকবে না। কৈবর্ত যদি না থাকে, তাদের মন্দির থাকবে কেন? মন্দিরকে ঘিরে কোনো না কোনো সময়ে কৈবর্তরা আবার একত্র হতে থাকবে। সমবেত কৈবর্তদের মধ্য থেকে হঠাৎ কেউ আওয়াজ তুলবে—জয়, বরেন্দ্রির জয়; জয়, কৈবর্তভূমির জয়। অশিক্ষিত, গোঁয়ার কৈবর্তরা বলবে—মোরাদের রাজা ফিরে এসেছে। তুমিই মোদের দিব্যোক, তুমিই মোরাদের ভীম। ওকে ভর করে কৈবর্তভূমি আবার জাগবে। শিবমন্দির ধ্বংস করো সবার আগে।

শিবমন্দির আক্রমণ করল পালরা। সামন্তদের ভাড়াটে সৈন্যরা সবচেয়ে বেপরোয়া। তারা মন্দিরের সোপান ভাঙতে লাগল, দরজা উপড়াতে লাগল। সোনা-দানা, মণি-মুক্তা, কড়ি-কপর্দক—যা কিছু মন্দিরে ছিল, সবই লুণ্ঠন করতে লাগল।

মন্দিরের পুরোহিত পালালেন সবার আগে—য পলায়তি স জীবতি। স্কন্ধগুলো থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে, দলে দলে পাল সৈন্য ছড়িয়ে পড়ল সমস্ত ডমরনগরে। কালিন্দীর এপারের-ওপারের কৈবর্তরা যেদিকে চোখ গেল, সেদিকে পালাতে লাগল।

জানকি বলল, 'চল রে বিটিরা, তৈয়ার হয়ে নে। মোরাদেরও পলাতে হবে।'

সুবর্ণা বলল, 'কেন পলাব মাসি মোরা? কী দুষ করিছি মোরা?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জানকি দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, 'মোদের দুষের কি অন্ত আছে রে, বিটি! মোরা যে কৈবর্তরাজ্যের বেশ্যা।'

কুন্তি বলল, 'সবার কাছে তো বেশ্যা দরকার। বেশ্যাদের মাংসের সোয়াদ নিতে তো সবাই চায়।'

জানকি বলল, 'এখন পাল রাজার মনে বড় জ্বালা। এ দেশ নাকি ওরাদের ছিল একদিন। মোদের রাজা দিব্যোক কেড়ে নিছিল। বহু দিন পর দখল করিছে পুনরায় ডমরনগর। ওরা কি আস্ত রাখবে এই রাজধানী? এই বেশ্যাপল্লি?'

সুবর্ণা বলল, 'এই এত দিনের পরিচিত থান, মা-জননীর জন্মভূমি এই পল্লি, ইখানে আমার জন্ম গো, মাসি।'

'তোহার জন্মথান তো কী হইছে? প্রাণ বড় না থান বড়? প্রাণ থাকলে থানের অভাব হবে না। প্রাণ বাঁচা আগে বিটি,' জানকি বলে।

বারাঙ্গনাপল্লির মেয়েরা থতমত খায়। কী করবে বুঝে উঠতে পারে না। একদিকে জানকির সাবধানবাণী, অন্যদিকে জন্মস্থানের টান—কোনটাকে মেনে নেবে বাররামারা?

দময়ন্তী বলল, 'কুথা পলাব মোরা?'

'যিদিকে চখ যায়, সিদিকে পলাব মোরা।' জানকি বলে।

কুন্তি বলে, 'পালিয়ে বাঁচতে পারব মোরা? মোরাদের ছাড়বে পাল রাজা? যিখানে পাবে, কচুকাটা করবে।'

জানকি বলে, 'পলালেই বাঁচব। তর্ক করিস না, বিটিরা। আপনি বাঁচলে বাপের নাম।'

'পলায়ে গিয়ে খাব কী? বাঁচব কেমনে?' জিজ্ঞেস করে কুন্তি।

'কেন রে বিটি, মোদের মূলধন তো মোরাদের সঙ্গেই আছে। অই মূলধন ভাঙ্গি খাব।' একটু থেমে জানকি আবার বলে, 'মোরা যিখানে যাব, সিখানে বাজার। মোদের ঘিরে নগর বসবে, ঘরে নাগর আসবে। চল চল, আর কথা বাড়াইস না। দামি যা আছে পুঁটলি বাঁধ। এই বেলাতে বাইর হতে হবে। নইলে মরণ।'

মোহনা এতক্ষণ চুপচাপ জানকিদের কথা শুনছিল। হঠাৎ করেই বলে উঠল সে, 'তোমরা যাও। আমি পালাব না।'

'কেন? কেন তুই পলাবি না, বিটি?' জানকি উদ্বেগাকুল কণ্ঠে বলে।

'কোথায় পালাব? কেন পালাব? খাব কী?' মোহনা জানতে চায়।

জানকি বলে, 'হারে বিটি, এ কথার উত্তর তো আমি আগে দিয়েছি। তুর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খাবার অভাব হবে নাকি? এই রূপ, এই যৌবন!'

'এই সহায়সম্পত্তি। এই ঐশ্বর্য। কোথায় পাব আমি? চণ্ডককে কোথায় পাব?' মোহনা বলে।

'ওয়াক থু। থু দিই আমি চণ্ডকের মুখে। ওই পাষণ্ডের নাম লিবি না, মোহনা, বলে দিলাম তুরে,' কুন্তি ঘৃণায় ফেটে পড়ে বলল।

'তুমি যাই বলো আর তাই বলো—চণ্ডক আমার নাগর। তার জন্য আমার আজকের এই দিন, এই সুখ, এই নিরাপত্তা।' সিন্দুক থেকে বঁটিটি বের করতে করতে বলে মোহনা।

জানকি বলে ওঠে, 'পাষণ্ড চণ্ডকের বিশ্বাসঘাতকতা তুর কাছে কিছুই না তাহলে?'

বঁটির গায়ে হাত বোলাতে বোলাতে মোহনা বলে, 'একটা ভুল চণ্ডক করে ফেলেছে। যদি বলো বিশ্বাসঘাতকতা, তা-ই সই; বিশ্বাসঘাতকতাই না হয় করেছে চণ্ডক, এই ত্রিভুবনে বিশ্বাসঘাতকের অভাব আছে নাকি? তাদের দলে একজন বাড়ল না হয়। আর চণ্ডক তো আমাকে ভালোবাসে, তাকে ফেলে যাব কোথায় আমি?' তারপর কণ্ঠ নামিয়ে মোহনা আবার বলে, 'তাকে ফেলে আমার পালিয়ে যাওয়া তো উচিত নয়, মাসি। আমার যে বড় পাপ হবে।'

জানকি বড় ভালোবাসে মোহনাকে। সেই ছোট্টবেলাটি থেকে নিজের কন্যার মতো স্নেহ দিয়ে, মমতায় জড়িয়ে মোহনাকে বড় করেছে জানকি। তাকে ফেলে পালিয়ে যাবে—ভাবতেই বুকে মোচড় দিয়ে ওঠে জানকির। তার স্নেহের পুত্তুলিকে একা ফেলে পালিয়ে যাবে কী করে সে?

মায়ের স্নেহ ঢেলে মোহনার হাত ধরে জানকি বলে, 'জিদ করিস না, বিটি। প্রাণ বাঁচা আগে। এক চণ্ডকের পর আরেক চণ্ডক আসবে তুর জীবনে। ভাবিস না, চল।'

'না মাসি, আমি যাব না। আমি চণ্ডকের জন্য অপেক্ষা করব। তোমরা যাও, মাসি।' হাত ছাড়িয়ে নিতে নিতে মোহনা বলে।

কুন্তি এবার ক্ষোভে ফেটে পড়ে, 'হ, তোহার তো এখন সুদিন। তোহার চণ্ডক এখন ক্ষমতাবান। ভীমের সেনাদলে ছিল। ভীম তারে পুত্র বলত। সেই পুত্র। থু থু থু। হাজারবার থু, লক্ষবার থু দিই আমি অই পাষণ্ডের মুখে। বিশ্বাসঘাতক। মোরাদের রাজাকে ধরায়ে দিল। আর তোহারে বলি, মোহনা, পাষণ্ড কুলাঙ্গারের লাগি তুর ভালোবাসার অন্ত নাই। তুর কি বিবেক নাই? যে মোরাদের এত ক্ষতি করল, তার লাগি অপেক্ষা! তোহারেও থু দিতে ইচ্ছি করে রে, মোহনা।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কুন্তির কথায় মোহনার মধ্যে কোনো ভাবান্তর হয় না। অত্যন্ত শান্ত-স্বাভাবিক কণ্ঠে মোহনা বলে, 'তুমি আমাকে থু দাও আর অপমান করো, আমার এক কথা—চণ্ডকের জন্য আমাকে এই পল্লিতে থেকে যেতে হবে। তার ভালোবাসার দাম চুকাতে হবে যে আমাকে।'

জানকিও নিজের ক্ষোভকে আর নিজের মধ্যে চেপে রাখতে পারল না। বিক্ষুব্ধ স্বরে বলে উঠল, 'মোহনারে বুঝিয়ে লাভ নাইরে, কুন্তি। ও এখন আন্ধা হয়েছে। চণ্ডকের প্রেমে আন্ধা হয়ে মাসিরে ভুলিছে। আমার বিটি মাসি জানকিরে ছাড়তে রাজি, চণ্ডককে ছাড়তে রাজি না। থাক বিটি, তুই থাক। অপেক্ষা করি থাক তুর চণ্ডকের লাগি। মোর যে প্রাণের ভয় আছে রে, মা, তাই গেলাম আমি।'

কুন্তি আগের মতো উষ্ণ গলায় বলল, 'বিশ্বাসঘাতক চণ্ডক এখন রামপালের চেলা। বৌদ্ধদের কাছে এখন ও ব্যাটার অনেক দাম। মর্কট চণ্ডক তোহার নাগর। তোহার পলানোর দরকার নাই।'

মোহনা বলে, 'হ্যাঁ, আমি পালাব কেন? নাগর আমার এখন অনেক ক্ষমতাধর। সে আমাকে পট্টবস্ত্র দেবে; সোনার গয়না দেবে। গজমোতির হার পরাবে।'

কুন্তি এবার গর্জে উঠল, 'মূর্খ তুই। বিশ্বাসঘাতককে শরীর দিবি তুই?'

মোহনা নিস্পৃহ কণ্ঠে বলে, 'মূর্খ বলো আর যা-ই বলো, আমি কিন্তু পালাব না।' তারপর জানকির দিকে মুখ ফিরিয়ে করুণ কণ্ঠে মোহনা বলে, 'আমাকে ভুল বুঝো না, মাসি। জীবনে যার আশ্রয় পেয়েছি, তার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করি কী করে, বলো। তার ভালোবাসার মূল্য দিতে হবে না আমাকে? মাসি, তার ভালোবাসার দাম আমাকে চুকাতেই হবে।' মোহনা হঠাৎ চুপ মেরে গেল। চোখ বন্ধ করে কী যেন ভাবল কিছুক্ষণ। তারপর আকুল হয়ে জানকিকে জড়িয়ে ধরে বলল, 'আর দেরি করো না, মাসি। তোমরা পালাও। আমাকে ক্ষমা করো, মাসি, ক্ষমা করো। তোমার ঋণকে অস্বীকার করে আমি এখানে থেকে যাচ্ছি। তোমার মনের কষ্টের ব্যাপারটি আমি বুঝতে পারছি। তার পরও আমি নিরুপায়। তুমি এখন যাও, মাসি। আমাকে সাজতে বসতে হবে, মাসি। আমি জানি, আজকে আমার ঘরে চণ্ডক আসবে।'

ঠেলে সবাইকে ঘর থেকে বের করে দিল মোহনা। তারপর ঘরে কপাট দিল।

বারাঙ্গনাপল্লির রামারা পালাল। তাদের ঘিরে-বেড়ে যে পুরুষেরা ছিল, তারাও পালাল। জানকির করা গুপ্তপথ দিয়েই পালাল তারা। শুধু পালাল না মোহনা,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পালাল না ধনারাম আর পালাল না সনকা বুড়ি। একদার সনকা বেশ্যা যৌবন হারিয়ে এখন বুড়ি। সে-ও পালাত, বার্ধক্যের কারণে চলৎশক্তি হারিয়েছে। তাই সে পালাল না।

আর ধনারামের এক কথা, 'দিদি যিখানে, আমি সিখানে। দিদি সগ্গে গেলে আমি সগ্গে, দিদি নরকে গেলে আমি নরকে।'

মোহনার দুয়ারজুড়ে বসে থাকল ধনারাম। একদল পাল সৈন্য ঢুকল বারাঙ্গনাপাড়ায়। সনকাকে সামনে পেয়ে জিজ্ঞেস করল, 'এটা কী পাড়া?'

সনকা বুড়ি বলে, 'ইটা বেশ্যাপাড়া গো, বেবুশ্যে পাড়া।'

'বেবুশ্যে পাড়া?' দলনেতা জিজ্ঞেস করে।

'হেঁ গো, হেঁ। পতিতাপাড়া ইটি। তবে কাউরে পাবে না ইখানে। সবাই পলায়ে গিছে,' সনকা বলে।

একজন সৈন্য ঠাট্টাচ্ছলে জিজ্ঞেস করে, 'তুমি পালাওনি কেন?'

'হাসালে বিটা। যিটার লাগি বারবামারা পলায়ে গিছে, সিটা তো আমার ফুরাইয়া গিছে। তাই আমি পলাই নাই,' থোবড়ানো গালে দন্তহীন মুখে কথাগুলো বলল সনকা।

'ওরা কোন দিকে গেছে বলতে পারবি তুই?' হিংস্র গলায় দলনেতা বলে ওঠে।

সনকা বলে, 'সম্বাদ জানি। কিন্তু বলব না।'

'কেন বলবি না?'

'মুই কৈবর্তের বিটি হই। মুই বরেন্দ্রির বিটি হই। ভীম মোরাদের সুয্যি হয়।'

সনকার কথা শুনে দলপ্রধানের মাথায় আগুন জ্বলে ওঠে। তরবারি কোষমুক্ত করে। সনকার মাথা ধুলায় গড়ায়।

ওখান থেকেই ফিরে যায় সৈন্যদল। পাড়ার অভ্যন্তরে যায় না। মোহনার ঘরটি পাড়ার ও-প্রান্তে।

ঘরে কপাট দিয়ে সাজতে বসে মোহনা। সেদিন হলুদ শাড়ি পরা মোহনাকে দেখে চণ্ডক বলেছিল—তুমি এত সুন্দরী! আগে তো এমন করে খেয়াল করিনি, মোহনা! হঠাৎ চণ্ডকের সেদিনের কথাটিই মনে পড়ে গেল মোহনার। সেদিনের মতো করেই নিজেকে সাজাল মোহনা। সেই হলুদ পট্টবস্ত্র, খোঁপায় হলুদ ফিতা, হলুদ টিপ—এসব। তার সিন্দুকে যত অলংকারপাতি ছিল, সবই অঙ্গে জড়াল মোহনা। আর গলায় সেই নবরত্ন হারটি, যা একদিন চণ্ডক তাকে দিয়েছিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তারপর মোহনার অপেক্ষা চণ্ডকের জন্য। মোহনা ধনারামকে ডেকে বলল, 'দেখ ধনারাম, আজ চণ্ডক আসবে আমার ঘরে। সতর্ক থাকবি। দেখলেই ত্বরিত সংবাদ দিবি আমাকে। আর খাবারদাবারের আয়োজন রাখবি।'

'তুমি যা বলিছ, দিদি, সবই ঠিক রাখব। কিন্তুক দিদি, তুমি সম্মাদ পেলে কার কাছ থেকে যে চণ্ডকদেব আজ রাতে তোহার ঘরে আসবে?'

'হ্যাঁদারাম, মানুষে সংবাদ দেবে কেন? মন আছে না আমার? আমার অন্তরই আমাকে সংবাদ দিয়েছে—আজ আমার ঘরে চণ্ডক আসবে।' মোহনা হাসতে হাসতে বলল।

ধনারাম মোহনার কথার মাথামুণ্ড কিছুই বুঝল না। মাথা চুলকে আমতা আমতা করে বলল, 'কিছুই বুঝতে পারলাম না, দিদি।'

'তোকে বুঝতে হবে না। যা বলেছি তাই কর। খাবারের আয়োজন হলে পথ চেয়ে বসে থাক,' মোহনা বলল।

সত্যিই সে রাতে চণ্ডক এল মোহনার ঘরে। গোটা দিনের ক্লান্তি তার শরীরজুড়ে। কত পরিশ্রম করতে হয়েছে তাকে আজ! সেই ভোরসকালে যুদ্ধ শুরু হয়েছে। ভীমের পাশে পাশে থেকে মরণপণ যুদ্ধ করে যেতে হয়েছে। অন্যদিনের চেয়েও বেশি আন্তরিকতার সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয়েছে তাকে। কোনোক্রমেই ভীম যাতে তাকে সন্দেহ না করে। ভীম একবার গর্জন করলে চণ্ডক তিনবার গর্জন করে উঠেছে। ভীম একজন শত্রুসৈন্য নিধন করলে চণ্ডক করেছে দুজন। ভীম যুদ্ধক্ষেত্রে এক কদম এগোলো তো চণ্ডক এগিয়েছে পাঁচ কদম। তারপর তো অস্ত্রাঘাত, হিমালয়ের চোরে। ভয় ছিল—কোনো কৈবর্তসৈন্য দেখে ফেলল কি না। কিন্তু ভাগ্য ভালো—কেউ লক্ষ করেনি তার অপকর্মকে। এ-ও ভয় ছিল যে কৈবর্ত সেনারা তাকে ঘিরে ধরে কি না। কিন্তু কী আশ্চর্য! ভীম পাগলপ্রায় হাতির পিঠে চড়ে পাল সৈন্যদের চক্রব্যূহে ঢুকে যাওয়ার পর খুব বেশিক্ষণ দাঁড়াতে পারল না কৈবর্ত সেনারা। ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। শর্ব, কঙ্কণ আর অন্যান্য সমরনায়ক—যারা যারা ছিল যুদ্ধক্ষেত্রে, আপ্রাণ চেষ্টা করেও সৈন্যদের ফিরিয়ে আনতে পারল না।

যুদ্ধশেষে তো কাজের দায়িত্ব আরও বেড়ে গেল। বিত্তপাল বলল, 'নিধন চাই, সবংশে নিধন চাই ভীমের।' তারপর সমস্ত দিন তো এখানে-ওখানে ঘর্মাক্ত কলেবরে দৌড়াদৌড়ি। একে ধর, তাকে ধর, একে কাট, ওর মুণ্ড নামাও। এরপর তো আরও কঠিন কাজ। মশানের কাজ কি কম কঠিন? ভীম থেকে আরম্ভ করে তার ছোট্ট নাতিটি পর্যন্ত—সবার মাথা কেটে নামানো কি কম ঝক্কির ব্যাপার? মশানের চারদিকে আপামর জনতা। আশঙ্কা তো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছিলই—যদি আওয়াজ তোলে, যদি একজোট হয়ে আক্রমণ করে। কিন্তু ম্যাদামারা কৈবর্তরা কিছুই করল না। শুধু বলল—জয়, বরেন্দ্রি সূর্য ভীমের জয়। আরে ব্যাটারা, কিসের জয়, কার জয়? যার জয় চাইছিস, সে তো এক পল পরে খড়্গের নিচে মাথা দিতে বাধ্য হবে।

এসব করতে করতে আঁধার নেমে গেল ধরিত্রীতে। বিত্তপাল পিঠ চাপড়ে বলল, 'অনেক বড় একটা কর্ম সমাধান করলে, চণ্ডক। তুমি পালদের বন্ধু, বন্ধু নও শুধু, সুহৃদ তুমি বৌদ্ধদের। কাল তুমি রাজসভায় এসো। পুরস্কার পাবে তুমি।'

চণ্ডক খুশিতে আটখানা হয়ে মাথা নুইয়ে বলেছিল, 'যথা আজ্ঞা যুবরাজ বিত্তপাল।'

চণ্ডকের মনটা বড় ফুরফুরে হয়ে গিয়েছিল ওই সময়। অপার আনন্দে দেহমন হঠাৎ নেচে উঠেছিল তার। ওই সময় তার মোহনার কথা মনে পড়ে গেল। মন বলল—মোহনার কাছে তোমার এ মুহূর্তে একবার যাওয়া উচিত, চণ্ডক। তোমার আনন্দের ভাগ তাকে দেবে না তুমি? দেহ বলল—চণ্ডক, বেশ কদিন তো যাওনি তুমি মোহনার ঘরে। তোমার দেহের সব ক্লান্তি এক নিমেষেই উবে যাবে, যদি তুমি মোহনার ঘরে যাও। যাও তুমি চণ্ডক মোহনার কাছে। দেহের ভার নামানোর জন্য হলেও তোমার মোহনার ঘরে এই সময়ে যাওয়া উচিত। তাই সেই রাতে সে এল মোহনার ঘরে।

আনন্দে ভাসতে ভাসতে সে রাতে সে এসেছিল মোহনার কাছে। সঙ্গে দেহরক্ষী দল। তবে তারা কৈবর্ত নয়, বৌদ্ধ। আগে আসত সুখলাল, তার দল নিয়ে; এখন এল মিত্রবরুণ, তার দল নিয়ে।

দূর থেকে দেখে ধনারাম কপাটে করাঘাত করে বলেছিল, 'দিদি, আসিছে, চণ্ডকদেব আসিছে।'

ভেতর থেকে মোহনা বলেছিল, 'ঠিক আছে।'

ঘরের বাইরে এবং ভেতরে আলো জ্বালিয়ে রেখেছিল মোহনা। গৃহাভ্যন্তরের প্রদীপ অধিকতর উজ্জ্বল আলো ছড়াচ্ছিল। ঘরে অগুরু চন্দনের সুগন্ধি। বাটাভরা তাম্বুল, পাশে গুবাক। থরে থরে পুষ্প সাজানো।

লোভনীয় দেহ মোহনার, তার মদির চোখে প্রবল প্রতাপী কটাক্ষ। চণ্ডকের মন আনচান করে উঠেছিল। কুল কুল করে দেহে জেগেছিল প্রবল স্রোতের টান।

চণ্ডককেই কাছে টেনে নিয়েছিল মোহনা। মোহনার কূলে সে নৌকা বেঁধেছিল। তারপর মোহনায় অবগাহনে নেমেছিল সে। বড় তৃপ্তি নিয়ে বারবার অবগাহন করেছিল সে মোহনার জলে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দরজায় টোকা দিয়ে ধনারাম খাবারের কথা বলেছিল। চণ্ডক বলেছিল, 'খাবনা রে ধনা আজ। আমার দেহরক্ষীদের মধ্যে বিলিয়ে দে খাবার।'

তারপর চণ্ডক আবার মেতেছিল মোহনাকে নিয়ে, মোহনার শরীরকে নিয়ে।

একটা সময়ে, রাতের শেষ প্রহর তখন, কক্ষের ভেতরটা আলোয় ভেসে যাচ্ছিল তখন, পালঙ্ক থেকে নেমেছিল চণ্ডক।

বলেছিল, 'এ বেলা যাই রে, মোহনা, অনেক দূর যেতে হবে আমাকে। মহারাজ রামপালের রাজধানী রামাবতিতে যেতে হবে।'

মোহনা জিজ্ঞেস করেছিল, 'কেন, কেন যাবে রামাবতিতে?'

চণ্ডক কণ্ঠে উচ্ছ্বাস ঢেলে বলেছিল, 'পাগলি কোথাকার! কেন যাব জানো না?'

'না,' মোহনা বলেছিল।

চণ্ডক বলেছিল, 'কালকে আমার পুরস্কার পাবার দিন। সমস্ত জীবনটাই কেটে গেল কৈবর্তদের দাসত্ব করতে করতে। কৈবর্তরা নীচ জাত। এই হীন জাতটার সামান্য সমরনায়ক ছিলাম আমি। পালরা রাজার জাত। সসাগরা সাম্রাজ্যের অধিপতি তাঁরা। এই রাজবংশের বিখ্যাত কাহিনির সেনাপ্রধান হব আমি। মহারাজ রামপাল কথা দিয়েছেন, আমাকে পাল বাহিনীর প্রধান করবেন। অশেষ ক্ষমতা হবে আমার। পালরাজ্য আর এই কৈবর্তভূমির সর্বাধিকারী মহারাজা রামপাল, স্বয়ং আমি তাঁর বাহিনীর সর্বাধিনায়ক! আমার সামনে মহারাজ ছাড়া আর সবাই মাথা ঝুঁকিয়ে কথা বলবে! কী আনন্দ, তাই না?' বলতে বলতে দরজা খুলে বাইরে পা বাড়াল চণ্ডক।

পেছন থেকে চণ্ডকের কানে ভেসে এল মোহনার কণ্ঠ, 'তোর আসল পুরস্কারটা নিয়ে যা রে, চণ্ডক। তোরে এই পুরস্কার দেওয়ার জন্য আমি পালিয়ে যাই নাই। অধীর আগ্রহে তোর জন্য প্রতীক্ষা করেছি।'

চমকে পেছন ফিরল চণ্ডক। বিহ্বল-বিস্ফারিত চোখে দেখল, মোহনার প্রচণ্ড ঘৃণা মেশানো চোখ থেকে আগুন ঝরছে।

'মোহনা, কী করছ, কী করছ, মোহনা?' বলতে চাইল চণ্ডক।

তার আগেই চণ্ডকের মস্তক বরাবর মোহনার হাতের বঁটিটি নেমে এল। ভূমিতে লুটিয়ে পড়ল মোহনার ভালোবাসার চণ্ডক, মোহনার ঘৃণার চণ্ডক।

উন্মাদিনীর মতো মোহনা হেসে উঠল—খিল খিল খিল খিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~